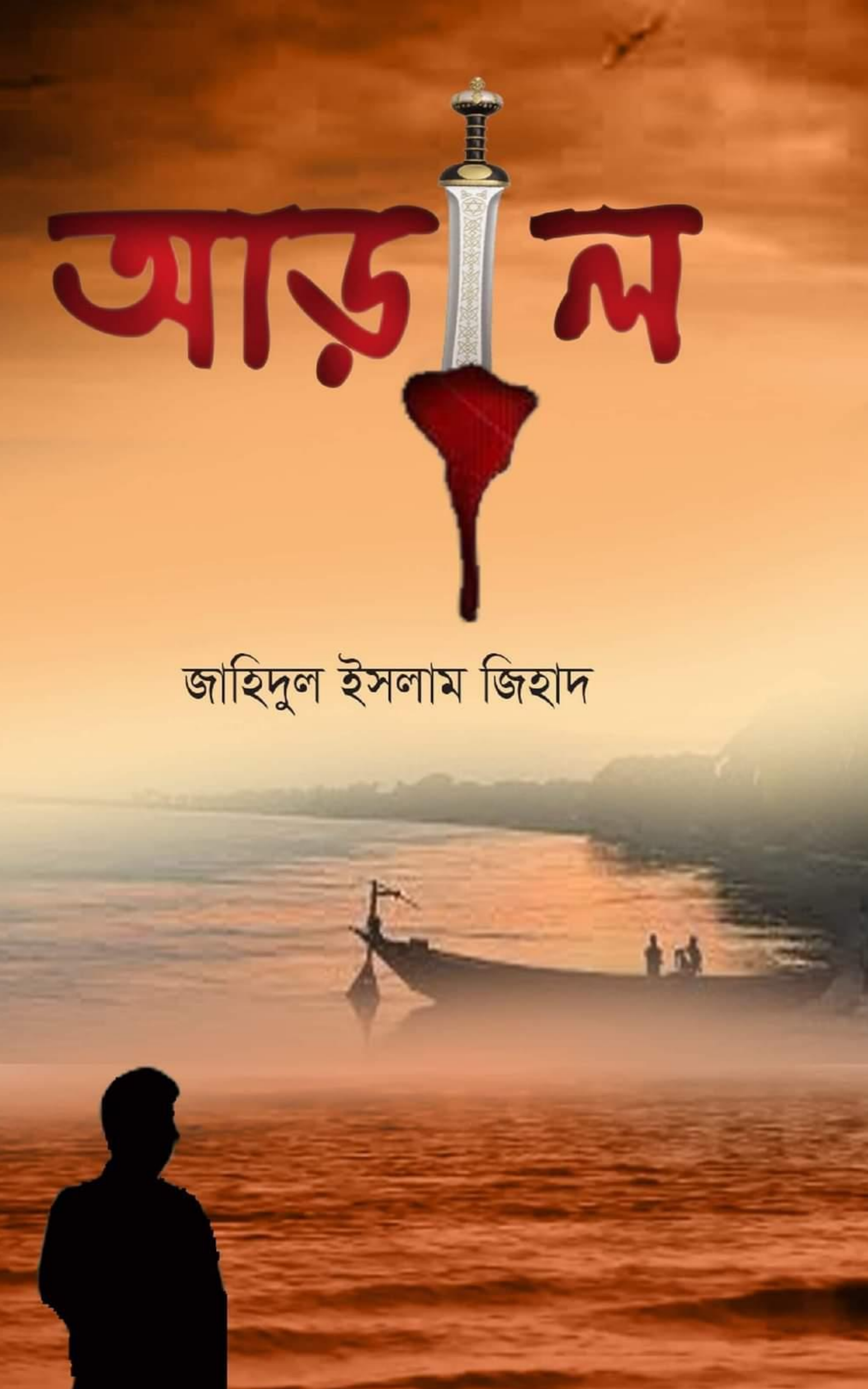
আড়াল
জাহিদুল ইসলাম জিহাদ

আড়াল

জাহিদুল ইসলাম জিহাদ

উৎসর্গ

আমার অবাধ্যতায় যারা কখনো ব্যথিত হয় না ও আমার খামখেয়ালিপনায় যারা সবসময় ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে থাকে।
প্রিয় বাবা-মা।

অধ্যায়-১

পেছন থেকে কে যেন একটু পর পর ভাইয়া ভাইয়া বলে ডাকছে। গলাটা খুব পরিচিত লাগছে। তবে এত দূর থেকে কার গলা বাতাসে ভেসে আসছে তা মিলাতে পারছি না। নিশ্চিত হতে ঘুরে তাকালাম, শিলা। আমি কোনো জবাব না দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আর ওর দৌড়ে আসার বেগ পর্যবেক্ষণ করছি। শিলা অনেক দূর থেকে বাতাসের গতিতে ছুটে আসছে। স্কুলের দৌড় প্রতিযোগিতায় বরাবরই ও প্রথম স্থান অধিকার করত। আজও এর সেই তেজ যায়নি। খানিকক্ষণ পর আমার সামনে এলো আর কোনো কথা না বলে হাপাতে লাগল। আমি বিরক্ত গলায় জিজ্ঞেস করলাম,

"এত ছুটছিস কেন?"

"তুই নাকি ঢাকায় যাচ্ছিস?"

শিলার থেকে আমি এক বছর তিন মাসের বড়। পিঠাপিঠি ভাই-বোনরা একে অপরকে 'তুই' বলেই ডাকে।

"হ্যাঁ যাচ্ছি, আটকাতে আসছিস?"

"না।"

"তাহলে?"

"আমার জন্য হলুদ বেনারসি শাড়ি নিয়ে আসবি।"

শিলার হলুদ শাড়ি প্রিয়। স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ও এই হলুদ শাড়ি পরে নৃত্য করত। সবাই অন্যান্য রঙের শাড়ি পরলেও শিলা হলুদ শাড়িই পরত। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শখ নাকি পাল্টাতে থাকে। কিন্তু শিলার পালটায়নি। অনেকটা রাগীভাবে বললাম,

"আর আসবই না।"

শিলা রসিকতার ছলে বলল,

"তাহলে আমারে নিয়ে যা। তুই শাড়ি কিনে দিবি আর আমি শাড়ির পুঁটলি নিয়ে বাড়ি চলে আসব।"

শিলা প্রায় সময় আমার সঙ্গে ছেলেমানুষি করে কথা বলে। এতে আমি বিরক্ত হই না। তবে এখন খুব বিরক্ত হচ্ছি। ওর কথা শুনে আমি ভুরু কুঁচকে সামনের দিকে হাঁটা শুরু করলাম। ও পেছন পেছন হাঁটছে। মিনিট কয়েক হাঁটার পর দেখলাম উত্তর আকাশে কালো মেঘের আস্তরণ। চারপাশের প্রকৃতি ঝাপসা। দাঁড়িয়ে শিলাকে বললাম,

"বাড়িতে যা, আবহাওয়া খারাপ হইতাছে, ঝড়-বৃষ্টি হবে।" ও মাথা নিচের দিকে নামিয়ে বলল,

"তোকে না নিয়ে যাব না।"

আমি কিছু একটা বলতে যাব এর মধ্যে ঠান্ডা বাতাস শুরু হলো আর সঙ্গে বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টি। আমরা দৌড়ে খানিকটা দূরে একটা বন্ধ দোকানের সামনে দাঁড়ালাম। গ্রামের রাস্তার পাশে সাধারণত একটা দুটো দোকান দেখা যায়। বেশিরভাগ চা, সিগারেট, বিস্কুট, পান এগুলো পাওয়া যায়। কসমেটিকস ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে বন্দরে যেতে হয়। বাতাসের বেগের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি সমান তালে নামছে। আশপাশের গাছগুলো এদিক সেদিক বাহারি নৃত্য করে যাচ্ছে। এর মধ্যে কয়েকটা গাছের ডাল ভেঙে পড়েছে। শিলা দোকানের বেড়ার সঙ্গে হেলান দিয়ে আছে আর মুখ নাড়ছে। মনে হয় দোয়া পড়ছে। ছোটবেলা যখন ঝড় হতো তখন ঘরের সামনের দরজা খুলে আমি ঝড় দেখতাম। ভয়ংকর আবহাওয়া দেখতে আমার ভালো লাগত। শিলা মায়ের কোলে বসে ভয়ে কাঁদত আর কিছুক্ষণ পর পর তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরত। মা বিড়বিড় করে দোয়া পড়ত আর আমাদেরও পড়তে বলত। ইউনুস দোয়া।

লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জোয়ালিমিন।

আমি জানি শিলা এখন ঐ দোয়াটিই পড়ছে। আর অনেক ভয় পাচ্ছে কিন্তু উপরে এমন ভাব যেন সবকিছু তার কাছে স্বাভাবিক। কিছুক্ষণ পর শিলা কাতর স্বরে বলল,

"ভাইয়া"

"হুম"

"ভয় করছে খুব, একটু আমার পাশে আয়।"

আমি শিলার পাশে গিয়ে ডান হাত ওর মাথায় দিয়ে নেড়ে বললাম,

"কিচ্ছু হবে না। ঝড় থেমে যাবে।"

"ঝড় থামলে বাড়ি যাবি না?"

"ভালো লাগছে না, রোজ আম্মার ডাকাডাকি শুনতে ভালো লাগে না।"

"আরে আম্মা তো ঐরকমই, আমার সাথেও তো ডাকাডাকি করে। আমি কি রাগ করি?"

উল্টো আমার দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিল। কিন্তু আম্মার আমার সঙ্গে রাগ দেখানো আর শিলার সঙ্গে রাগ দেখানো এক পাল্লায় মাপা যায় না। আমি বেকার বলে চিল্লাচিল্লি করে। যুবকদের সবচেয়ে বড় অভিশাপ বেকারত্ব। আর এই বেকারত্ব নিয়ে কেউ খোঁচা দিলে কষ্টের শেষ থাকে না। আমি অনার্স শেষ করে অনেক জায়গায় চাকরির জন্য আবেদন করেছি। কোথাও চাকরি হয় নাই। প্রথম ধাপ ইন্টারভিউতে বাদ পড়ে যাই। তারপরও আমি হাল ছাড়ি নাই। এখনো চেষ্টা করে যাচ্ছি। বাড়িতে বসে বাবারটা কতকাল খাইবি? দুলামিঞা হইছিস। একথা আম্মার মুখ থেকে একদমই শুনতে ভালো লাগে না। শতি মা তাই আমার সঙ্গে এইরকম আচরণ করছে? কে জানে। আমার বয়স যখন চার আর শিলার বয়স প্রায় তিন বছর তখন আমার মা ব্রেইন টিউমারে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তারপর বছর দুয়েক পর বাবা প্রতিবেশীদের পরামর্শে আরেকটি বিয়ে করেন। বাবা এ ব্যাপারে নারাজ ছিলেন, তবুও আমাদের সুযোগ-সুবিধার খাতিরে আরেকটি বিয়ে করতে বাধ্য হন। এক বছর নাগাদ চাচী রান্না করে দিতেন তারপর উনি অসুখে বসে যান। তারপর চাচাতো বোন খাদিজা আপা।

কয়েক মাস পর তার বিয়ে হয়ে যায়। আর চাচীকেও খাদিজা আপার স্বামীর বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। বাবা দিশেহারা হয়েই বিয়েটা করেছেন। ঐ ঘরে এখন একটি ছেলে, কায়েস। আমার সৎ ভাই। তারপরও আপন ভাইদের মতো খাতির আমাদের। বাড়ি থেকে আসার সময় কায়েস স্কুলে ছিল। কয়েক মাস পর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। যদি দেখত যে আমি বাড়ি থেকে রাগ করে বের হয়েছি তাহলে কিছুতেই এ পর্যন্ত আসতে দিত না। বাতাসের বেগ কমে আসছে। কিন্তু থামার কোনো লক্ষণ দেখছি না। দূরে আব্বাকে দেখা যাচ্ছে। সাদা পাঞ্জাবি পরা ও ছাতা নিয়ে আমাদের দিকে আসছে। সামনের দিকে এক একটি পা পিচ্ছিল রাস্তায় সতর্ক অবস্থায় ফেলছে। বক যেমন পুঁটি মাছের সন্ধানে সামনের দিকে এগিয়ে চলে, আব্বাকেও অনেকটা সেরকম লাগছে। আব্বা এইদিকে আসছে আমি আর শিলা তার দিকে চেয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পর দোকানের সামনে এসে ছাতাটা গুটিয়ে দোকানের সামনের চালার নিচে এলো। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল,

"তোর মা একটু রাগারাগি করছে তাই বলে এই ঝড়ের মধ্যে ঘর থেকে চলে আসবি?" আমি মাথা নিচু করে আছি, আর মনে মনে বলছি ঝড়ের মধ্যে আসি নাই। ঝড়ের আগে আসছি। আমি ভাবছিলাম শিলা আমার হয়ে উত্তরটা দিয়ে দেবে কিন্তু দিল না। এখন শিলার উপর রাগ হচ্ছে। শিলাও কী বলবে! ও যদি বলতে যায় আব্বা ওকে এক ঝাড়ি দিয়ে চুপ করিয়ে রাখবে। আব্বার স্বভাব এইরকম, নিজে যা বলবে তাই। আশপাশের কারো কথা পাত্তা দেবে না। আমাদের নিস্তব্ধতার সুযোগ নিয়ে আব্বা আবার বলতে লাগল,

"ঘরের মহিলা সারাদিন কামকাজ করে, একটু-আধটু মাথা গরম হবেই। তাড়াতাড়ি বাড়িতে যা।" আমি ডান হাত দোকানের চালা থেকে বাইরে দিলাম আর আব্বাকে বুঝাতে চাইলাম বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির ফোঁটা হাতে পড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আব্বা আমার মনের ভাব বুঝে নাই। শিলা বলে উঠল,

"এখন তো খুব বৃষ্টি, কীভাবে যাব?"

"আমার মোশাররফ মিয়ার সঙ্গে একটু কথা আছে। বৃষ্টি মনে হয় আরেকটু পর থামবে। তখন তোরা দুই ভাই-বোন চলে যাস। আমি এখন একটু ঐদিকে যাই।"
এ কথা বলে আব্বা ছাতা মেলে ভারি বৃষ্টির মধ্যে চলে গেল। তাহলে আব্বা আমাকে আটকাতে নয়, মোশাররফ মিয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। মাঝখানে আমাকেও কিছু বলে গেলেন। বাঘ শিকারে বের হয়ে হরিণ শিকার যাকে বলে।

***

মোশাররফ মিয়া আমাদের এলাকার চেয়ারম্যান। টানা দুইবার তিনি ইউপি নির্বাচনে জয় লাভ করেন। এলাকায় তার বেশ নাম ডাক। আমি তার কার্যকলাপ সম্পর্কে তেমন জানি না। সেই মাধ্যমিক পাশ করে গ্রাম ছেড়েছি। তবে সবাই বলে বিচার ব্যবস্থায় তিনি খুব পারদর্শী, সবকিছু নিরপেক্ষভাবে সামাল দিয়ে থাকেন।

একবার আমাদের গ্রাম থেকে একটা যুবতী মেয়ে গায়েব হয়ে যায়। এলাকায় এটা নিয়ে বেশ হুলুস্থুল পরে যায়। খবরের কাগজেও লেখালেখি হয়। আমিও ঢাকায় বসে পড়েছিলাম। প্রতিবেদনটা এরকম ছিলো,

দেশে এক এর পর এক ধর্ষণের খবরে চারদিকে যখন আতঙ্ক তখনই হাশেমপুরে ঘটে গেলো এক কাকতালীয় কাহিনী। একাদশ শ্রেণিতে পড়ুয়া এক যুবতী মেয়ে মাঝরাত থেকে গায়েব। প্রথমে মেয়ের পরিবার সামাজিক হেয় প্রতিবন্ধকতা এড়াতে খবরটি দামাচাপা দিয়ে রাখে। যখন দুই দিন পেরোয় তখন তারা থানা পুলিশের কাছে ছুটে যায়। মেয়ের পরিবারে জিজ্ঞাসাবাদ করে এসআই জাহাঙ্গীর হাওলাদার জানান, মেয়ের পরিবারে মা আর মেয়ে থাকতেন। বাবা ঢাকায়

থাকেন। মেয়ে হারানোর খবর পেয়ে তিনি ছুটে এসেছেন। মেয়ের মা জরিনা খাতুন আমাদের জানান, "প্রতিদিনের মতো রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ি। ফারজানা একটু রাত করে পড়াশোনা করে ঘুমাতো। সেদিন রাতেও ফারজানা পড়াশোনা করছিল। আমি রাতে আর জাগতে পারিনি। ভোরে ফজরের নামাজ পড়তে উঠে দেখি ফারজানা নেই। আমি ফারজানার বাবাকে বিষয়টি জানালে সে দুইদিন চুপ থাকতে বলে। ফিরে না আসলে থানায় যাবে। তারপর দুইদিন পেরিয়ে যাওয়ার পর থানায় জানাই।" নাম না প্রকাশের শর্তে এক গ্রামবাসী জানান, তিনি কয়েকদিন ফারজানাকে এক ছেলের সাথে কথা বলতে দেখেছিলেন। এখন হতে পারে ঐ ছেলের সাথে পালিয়ে গেছে। ছেলের পরিচয় জিজ্ঞেস করলে তিনি ছেলেকে চেনেন না বলে অস্বীকার করেন। মেয়ের মা জরিনা খাতুন আরো বলেন, "ফারজানার কারো সাথে কোনো প্রকার সম্পর্ক ছিলো না। ফারজানা সারাদিন পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতো।"
চেয়ারম্যান মোশাররফ মিয়া বলেন, "এর আগে আমাদের গ্রামে এরকম ঘটনা ঘটে নাই। আমি খুব মর্মাহত এরকম ঘটনার জন্য। থানা পুলিশকে অবগত করা হয়েছে তারা যেন দ্রুত খুঁজে ফারজানাকে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়।"

কয়েকদিন পর পাশের গ্রামে ফারজানাকে পাওয়া যায়। তবে জীবিত নয়, মৃত। নদীর পানিতে ভেসে উঠেছিল। পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য লাশ নিতে চাইলে গ্রামের লোকজন দিতে অস্বীকার করে। তারা বলে, অন্য কেউ তাদের মেয়ের শরীর দেখুক এটা চায় না। চেয়ারম্যানও গ্রামের মানুষদের পক্ষে কথা বলেন। চেয়ারম্যানের নির্দেশে গ্রামের লোকেরা দ্রুত ফারজানার দাফন কাজ সম্পন্ন করে। পরে থানা পুলিশ তিনিই সামলেছিলেন। এই মহৎ কাজের জন্য গ্রামের লোকেরা এখনও তার পক্ষে সাফাই গায়। তারা হয়তো এটা জানে না, ময়নাতদন্তে আসল রহস্য বেরিয়ে আসতো।

মিনিট কয়েক দাঁড়িয়ে থাকার পর বৃষ্টি থেমে গেলো। শিলা বললো,
"বাড়িতে চল ভাইয়া।"
আমি সু খুলে হাতে নিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। শিলা ওর পায়ের জুতা খুলে আমার সাথে হাঁটার সঙ্গী হলো। পিচ্ছিল রাস্তায় হাঁটা মোটেও সহজ নয়। পায়ের আঙুল আঁকড়ে ধরে হাঁটতে হয়। শিলা দুহাত উপরে তুলে হাত এদিক সেদিক করে শরীরের ভারসাম্য রাখছে।

কিছুক্ষণ পর বাড়ি পৌঁছে গেলাম। পথে আমাদের কথা হয়নি। আম্মা দরজার পাশে বসে নকশিকাঁথা সেলাই করছে। গ্রামের মহিলাদের অভ্যাস বৃষ্টি দেখলেই কাঁথা নিয়ে বসে। অবসর সময় বৃথা যেতে দেয় না। আম্মা আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে আবার কাঁথা সেলাইয়ে মনোনিবেশ করলো। বুঝলাম, তার চোখের চাহনিতে কোনো কথা লুকিয়ে আছে। কিন্তু এখন প্রকাশ করছে না। হয়তো অন্য কোনোদিন সুযোগ বুঝে বলে দিবে।

আমি সামনে রাখা বৃষ্টির পানি জমা করা বালতিতে পা ধুয়ে ঘরের ভেতরে গেলাম। আমাদের ঘরটি ইট-বালুর তৈরি দালান। উপরে টিনের চালা। ঘরে একটি বারান্দাসহ চারটি রুম আছে। আমাদের তিন ভাইবোনদের জন্য তিনটি রুম বরাদ্দ এবং আরেক রুমে আব্বা-আম্মা থাকেন। আমি সোজা আমার রুমে চলে গেলাম। পরনের প্যান্ট-শার্ট না খুলেই খাটের উপর শুয়ে পড়লাম। তখন পেটের রাক্ষসটা জানান দিলো তার খাবারের প্রয়োজন।

শিলাকে ডাক দিয়ে খাবার চাইলাম। শিলা ভাত আর তরকারি নিয়ে আসলো। পছন্দের খাবার চিকন চালের ভাত ও নতুন আলু দিয়ে কই মাছের ঝোল। সকালে পুকুরে জাল ফেলে কই মাছগুলো ধরেছিলাম। আর এই কই মাছের স্বাদ না নিয়েই ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম।

ঘরে কারো উপস্থিতি টের পাচ্ছি। কায়েস আসছে! ওর স্বভাব এইরকম, ঘরে আসলে কাউকে আলাপ না দিয়ে নিজের রুমে চলে যাবে। আবার

বেরোবার সময় কাউকে না বলে এদিক সেদিক চলে যাবে। এজন্য ও পরিবারের সবার কাছে প্রায়ই বকা খায়। তারপরও ওর অভ্যাস পাল্টালো না।

কথায় আছে মানুষ অভ্যাসের দাস। এর প্রমাণ কায়েস। প্রতিদিনের মতো কায়েস কিছুক্ষণ পর আমার রুমে আসবে আর আমার ফোনটা নিয়ে গেম খেলবে। শিলা বললো,

"আরেকটু ভাত দেই?"

"না, তুই খাইছিস?"

"আরেকটু পর খাবো, আম্মা গোসল করে আসুক।"

খাওয়া শেষে আমি থালায় হাত ধুয়ে কিছু পানি মুখে নিয়ে কুলকুচি করতে করতে কায়েসের রুমের দিকে গেলাম। দেখলাম ও একটা কাগজ পড়ছে। আমাকে দেখে ও হতচকিয়ে কাগজটি এলোমেলো ভাঁজ করে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে নিলো। আমি পানির ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করলাম,

"কি ঐটা?"

ও স্বাভাবিকভাবে বললো, "কিছু না।"

তবে ও মোটেও স্বাভাবিক না। ভিতরে অনেক রাগ, এই সময় আমাকে ওর রুমে আশা করে নাই। আমি বাড়াবাড়ি না করে কায়েসের রুম থেকে বের হলাম। আমার ভেতরে এক একটা প্রশ্ন নাড়া দিতে লাগলো। আচ্ছা কায়েসের হাতে ঐটা কি প্রেমপত্র? কায়েস প্রেম করে? আমার তো মনে হয় না ওর সাথে কারো সম্পর্ক আছে। তাহলে ঐটা লুকালো কেনো? নিশ্চয়ই প্রেম করছে। করুক, এ বয়সের ছেলেমেয়েরা একটু-আধটু এইরকম করে। নির্দিষ্ট বয়সের পর সব ঠিক হয়ে যায়। আচ্ছা, ওর রুমে আমি কেনই বা হুট করে গেলাম? ধ্যাত! মানুষ টেনশনে থাকলে এইরকম করে। দিক-বেদিক কাজ করে

ফেলে। আমিও টেনশনে আছি। বাইরে যাবো, নিজের বিরক্তিকর ভাবটা কাটবে।

অধ্যায়-২

ঝড়-বৃষ্টির পর রোদের আলোয় চারপাশ ঝিকিমিকি করছে। গাছের পাতাগুলো দেখলে মনে হয় যৌবন ফিরে পেয়েছে। এর আগে আমার চোখ দুটো হঠাৎ এত আলোয় মানিয়ে নিতে কষ্টসাধ্য হলো। বাড়ির অনেকটা দূরে একটা খোলা জায়গা আছে। আজ বিকেলটা ওখানেই কাটিয়ে দেবো।

ঢালু জায়গায় সবুজ ঘাস বৃষ্টির হালকা পানিতে ডুবে আছে। আমি উঁচু জায়গায় একটা গাছের শিকড়ের উপর বসলাম। পানি না থাকলে ঘাসের উপর বসতাম। ঘাসের উপর লেপ্টে বসে থাকায় মনের ভেতর আলাদা সুখ পাওয়া যায়। প্যান্টের পকেটের ভেতর থেকে ফোন বের করলাম। বন্ধু সবুজকে কল করা যায়। ও আসলে জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে। কল করলাম, ফোন বন্ধ। এখন আমাকে একাই বিকেলটা পার করতে হবে। এটা ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। মন খারাপের সঙ্গী হিসেবে ফোনে একটা গান চালু করলাম, রবীন্দ্রসংগীত

আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া, বর্ষা আসে বসন্ত।

সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ছে। আশেপাশে কয়েকটা পাখির আনাগোনা। ঘাসের উপর পায়ের গোড়ালি সমান পানির উপর দিয়ে সাপের মতো করে কী যেন চলে গেল। আর কিছুক্ষণ পর মাগরিবের আজান হবে। আমার এখন বাড়ির দিকে যাওয়া দরকার। না, একবার সবুজের সাথে দেখা করে আসি। সবুজের বাড়ি গেলে মন্দ না।

সবুজের বাড়ি যেতে যেতে মাগরিবের আজান পড়ে গেল। আর একটু পরেই সবুজের বাড়ি। ওদের বাড়ির সামনে মসজিদ আছে। ওখানে মাগরিবের নামাজটা আদায় করে নেব। আমার অন্যান্য ওয়াক্তের নামাজ কাযা হলেও মাগরিবের নামাজ কাজা হয় না। সেই কবে থেকে ভেবে আসছি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবো, কিন্তু পড়া হয় না। হাশরের ময়দানে এর জন্য কঠিন বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। এ কথা মনে উঠলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে যায়।

মাগরিবের নামাজ শেষে সবুজের বাড়িতে গেলাম। ওর ঘরের সামনের দরজা খোলা এবং সামনের বারান্দায় কুপি জ্বলছে। আমাদের এলাকায় সামান্য ঝড়-বৃষ্টির সাথে বিদ্যুতের বনাবনি নেই। ঝড়-বৃষ্টির আভাস পেলেই বিদ্যুৎ চলে যায়। আজ রাতে আসবে কিনা জানি না। সামনে থেকে ডাক দিলাম,

"সবুজ!"

সাড়া না পেয়ে আরও দুইবার একটু পরপর ডাক দিলাম। দ্বিতীয় ডাকে সবুজের মা তসবিহ হাতে ঘরের সামনের বারান্দায় আসলেন। মনে হয় সবে মাগরিবের নামাজ শেষ করেছেন। আমাকে দেখে তিনি রোমাঞ্চিত চোখে বলে উঠলেন,

"এতদিন পর আমাদের কথা মনে পড়লো?"

আমি মুচকি হাসি দিয়ে বললাম,

"আসলে খালাম্মা, সবুজের সাথে প্রতিদিন বাইরে আড্ডা হয়। আজ ওর ফোনটা বন্ধ তাই চলে আসলাম।"

"আসবা তো সবুজের জন্য, আমাদের জন্য তো না।"

আমি লাজুক ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে, ঘাড়ের উপর মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললাম, "এখন থেকে আসবো ইনশাআল্লাহ।"

প্রসঙ্গ পালটাতে তিনি বললেন,

"সবুজ বাজারে গেছে, এখনো তো আসলো না, আর একটু পর আসবে। তুমি ঘরে উঠে বসো, চা করে দেই।"

"না খালাম্মা, তাহলে আমি বাজারের দিকে যাই, পরে একদিন আবার আসবো।"

"পরে না, বাজার থেকে সবুজের সাথে তুমিও আইসো।"
"দেখি।"
"দেখি না, আসবে কিন্তু!"

আমি মুচকি হাসির সাথে তাকে বললাম, "আচ্ছা, তাহলে বাজারের দিকে যাই।"

সবুজের মা বড্ড ভালো মানুষ। সবসময় মিশুক ভঙ্গিতে কথা বলেন। মাধ্যমিকে পড়ার সময় প্রায়ই সবুজের সাথে এই বাড়িতে আসতাম। তখন সবুজের মা আদরের কোনো ঘাটতি রাখতেন না। এখন তেমন আসা হয় না। মাঝে মাঝে হঠাৎ আসলে এমন আচরণ করেন যেন আপন ছেলে বহু বছর পর বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে।

***

বাজারে এক দোকানে সবুজের তালাশ করলাম। এই দোকানেই বেশিরভাগ সময় আড্ডা দেয়। দোকানদার ডানহাতের তর্জনী আঙুল তার ডান পাশ বরাবর দেখিয়ে বললো,
"ঐ দিকে কেরাম খেলে মনে হয়।"

ওখানে গেলাম। দেখি সবুজ সত্যিই কেরাম খেলছে। কেরাম বোর্ডের পাশে কতোগুলো লোক জড়ো আছে। আমাদের দেশে বেকারত্ব কেমন, তা কেরাম খেলার পাশে গেলেই বোঝা যায়। খেলে চারজনে, সাজেশন দেয় ষোলোজনে। কেউ সিগারেট ফুঁকতে ব্যস্ত আছে। আমার উপস্থিতি দেখে বিশেষ কায়দায় হাতে লুকিয়ে রেখেছে।
সবুজ আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো,
"আরে তুই এইদিকে কী মনে করে?"
"তোর কথা মনে পড়লো তাই এসে পড়লাম। তোর ফোন বন্ধ কেন?"

"চার্জ নাই রে।"

"অ।"

"দাঁড়া, এই গেমটা শেষ হোক। তুই হারুন মামার দোকানে বসে চা খা। আমি একটু পর আসতেছি।"

"আচ্ছা। তাড়াতাড়ি আসিস, বাড়ি ফিরতে হবে।"

আমি হারুন মামার দোকানের দিকে যেতে লাগলাম। ওমনি ও আবার ডাক দিলো। দেখলাম সবুজ ওর জায়গায় অন্য কাউকে দাঁড় করিয়ে আমার দিকে আসছে। এসে বললো,

"কোনো কারণে মন খারাপ?"

"না, কেন?"

"এমনি, চেহারা বাংলা পাঁচের মতো করে রাখছোস তাই জিজ্ঞেস করলাম।"

আমি হালকা হাসি দিয়ে বললাম, "না, তেমন কিছু না।"

হারুন মামার দোকানে চলে আসলাম। সবুজ তার উদ্দেশ্যে বললো,

"দুই কাপ চা দেন মামা।"

অমনি হারুন মামা ঝটপট দুইটা কাপ বালতির পানির মধ্যে চুবিয়ে কাপের মধ্যে দুধ আর চিনি দিতে লাগলো। মনে হয় সে এটা করার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত।

সবুজ আমার দিকে ফিরে বললো, "সিগারেট খাবি?"

"হু।"

"মামা, দুইটা সিগারেট দিয়েন।"

দুইটা সিগারেট আমাদের দিকে দিলো আর দোকানের খদ্দের বেড়ে গেলো। "মামা, সয়াবিন তেল আছে?" "মামা, আলুর কেজি কতো?" একজন এসে বললো, "হারুন, আমার ছোট মাইয়াটার জন্য একটা চিপস দে তো।"

হারুন মামা চা বানানো রেখে খদ্দের সামলানোর কাজে লেগে গেলেন। তারপর চায়ের কাপে লিকার ঢেলে কয়েকটা নাড়া দিয়ে দুই হাতে

আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। ততক্ষণে আমাদের সিগারেট খাওয়া প্রায় শেষ।

সবুজ বললো, "বড়ই হতাশ করলা মামা।"

হারুন মামা বললেন, "কেমনে?"

"এই যে, সিগারেট খাওয়া শেষ, তারপর চা দিলা। ভাবছিলাম দুইটা একসাথে জমিয়ে খাবো। সেটা হলো কই?"

হারুন মামা ফ্যালফ্যাল করে হেসে দিয়ে বললেন,

"দেখলেন না, লোকজনের ভিড় পইড়া গেছে। কেমনে কি করবো? তা এখন আরেকটা সিগারেট লইবেন?"

"না থাক, পরপর দুইটা সিগারেট ভালো লাগে না।"

তাদের এই কথা-আদানপ্রদানের ফাঁকে আমি চা প্রায় শেষ করে ফেলেছি। সবুজ আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে বললো,

"কিরে, শেষ করে ফেললি?"

"জাদু।"

"হ, জাদু! এই দেখ, আমি এক চুমুকে শেষ করবো।"

এই বলে ফরফর করে মুখে দিলো।

"ওরে, জিহ্বা পুড়লো রে!"

হারুন মামার এবার হাসি থামছে না। হারুন মামার সাথে আমিও সবুজের ছেলেমানুষী দেখে হাসির সঙ্গী হলাম।

সবুজ চা আর সিগারেটের বিল পরিশোধ করে আমার দিকে চেয়ে বললো,

"বাড়ির দিকে যাবি?"

"হুম। তুই যাবি না?"

"হুম, এখনই যাবো। বিদ্যুৎ মনে হয় আজ আসবে না রে। মা ঘরে একা, চল তোর সাথে যাই।"

পথে সবুজের সাথে কথা বলতে বলতে ওদের বাড়ি পর্যন্ত এসে যাই। সবুজ পুনঃপুন অনুরোধ করছিলো ওদের বাড়িতে রাতটা পার করার জন্য। আমি বিভিন্ন অজুহাত দিয়ে পার পেয়ে গেলাম।

অধ্যায়-৩

ঘরে কারো শোরগোল নেই। চারপাশে সবকিছু নিস্তব্ধ হয়ে আছে। বারান্দায় একটা কুপি জ্বলছে। আমার উপস্থিতি টের পেয়ে কায়েস রুম থেকে বেরিয়ে বললো,

"ভাইয়া, আজ মনে হয় বিদ্যুৎ আসবে না। তুমি আব্বাকে ফোন করে কয়টা মোমবাতি আনতে বলো। আমার হোমওয়ার্ক আছে।"

"আচ্ছা।"

আব্বাকে তিনবার ফোন করলাম, কিন্তু ফোন রিসিভ করলো না। কোনো কাজে হয়তো ব্যস্ত। এইদিকে আমার ফোনের চার্জ ফুরিয়ে আসছে। আমি আমার রুমে গিয়ে প্যান্ট আর শার্ট খুলে একটা লুঙ্গি পরে নিলাম। এখন নিজেকে অনেকটা ফুরফুরে লাগছে। আরামদায়ক পোশাক পরেছি, তাই হয়তো।

আম্মা বারান্দা থেকে ডাকছে,

"শিলা, কায়েস ভাত খেতে আয়। কেরোসিন নেই, কুপির তেল ফুরিয়ে যাবে।"

আম্মা আমাকে ডাকলো না। মনে হয় আমার উপস্থিতি টের পায়নি। নয়তো এখনো আমার উপর অভিমান করে আছেন।

শিলার ডাক শোনা যাচ্ছে,

"ভাইয়া, খেতে আয়।"

"আসছি।"

কায়েস খাবে না বলে বায়না ধরলো। প্রায় রাতে ও না খেয়ে থাকে। আমি গিয়ে শিলার দিকে তাকিয়ে বললাম,

"আব্বা আসুক, তারপর খাই।"

আম্মা ভুরু কুঁচকে শিলার দিকে চেয়ে বললো,

"সে বলে গেছে, তার আসতে দেরি হবে। চেয়ারম্যানের সাথে কী

নাকি জরুরি আলাপ আছে।"
আম্মা আর আমার মাঝে মনমালিন্য থাকায়, আমাদের মাঝে কথা আদান-প্রদানের একমাত্র নেটওয়ার্ক শিলা। এই নেটওয়ার্কিং-এর কাজটি করতে শিলার বিরক্ত লাগছে না।

আমি, শিলা আর আম্মা একসাথে রাতের খাবার কুপির মিটিমিটি আলোতে খেয়ে নিলাম। তারপর আমি আমার রুমে চলে গেলাম এবং মশারি টানিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পৃথিবীর সবচেয়ে বিরক্তিকর কাজ মশারি টানিয়ে বিছানার চারদিকে গোঁজা।
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এটা নিয়েই বেশি ঝগড়া হয়। কোনো কোনো রাতে রাগে-অভিমানে কেউ মশারি টানায় না। ফলস্বরূপ, সারারাত মশাদের একটা বড়সড় আসর হয়। আমার এমন কেউ নেই, তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজের মশারি নিজেরই টানাতে হয়।

সিগারেটের প্যাকেটটা দেখভাল করলাম। সেখানে এক কোনে দুইটা সিগারেট আছে। ভাবতেই ভালো লাগছে, গভীর রাতে সিগারেটের সাথে জমিয়ে দেওয়া যাবে।

অনেকক্ষণ শুয়ে থাকলাম আর গরমে এপাশ-ওপাশ করতে লাগলাম। ফোনের চার্জও ফুরিয়ে আসছে, তাই ফোন ঘাঁটা ছেড়ে দিলাম। ঐদিকে আব্বা এখনো আসছেন না।

অমনি আব্বার গলা খাঁকারির শব্দ শোনা গেলো। ঘরে আসার আগে উনি একবার কাশি দিবেন এটা তার নিয়ম। গলায় সুরসুরি থাকুক বা না থাকুক, জোর করে হলেও দিবেন।
আম্মার সাথে গুনগুন করে কী যেন বলছেন। আমি ঐ দিকে কান না দিয়ে, একটু আরামের জন্য পাশে রাখা পাখা নাড়তে লাগলাম। অস্বস্তিকর গরম। গলার নিচে কয়েক ফোঁটা ঘাম জমেছে। দূরে ব্যাঙের

ঘ্যাঁঙর ঘ্যাঁঙর ডাক শোনা যায়। আজ রাতে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বুঝতে পারছি।

অমনি আমার রুমে কুপি নিয়ে আম্মার উপস্থিতি। কুপিটি টেবিলের উপর রেখে, আমার বিছানার পাশে বসে পড়লেন। আর কী যেন ভাবতে লাগলেন। বুঝতে পারছি, কিছুক্ষণ পর তার ভাবনাগুলো আমার উপর সয়ে সয়ে নিক্ষেপ করবেন।

অবশেষে তাই হলো। আম্মা বলতে লাগলেন,

"তুই আর শিলা অনেক ছোট ছিলি, তখন এই বাড়িতে আমি পা রাখি। তোদেরকে মায়ের অভাবটা বুঝতে দেইনি। আপন মায়ের মতো তোদের ভালোবেসেছি। তারপরও তোদের কিছু বললে তোরা এমন রাগ দেখাস তখন সত্যি খুব কষ্ট লাগে। তোর আব্বা ছোটখাটো একটা ব্যবসা করে। তাতে আমাদের সংসার ভালোই চলে। কিন্তু দিন তো এভাবে যাবে না। আল্লাহ না করুক, তোর আব্বার কিছু হয়ে গেলে কী করবি! আর শিলার বিয়ে দিতে হবে। কয়েক বছর পর তোরও বিয়ে করতে হবে। বউ হবে, বাচ্চা হবে তখন কী করবি?
এইজন্য আমি মাঝে মাঝে তোকে চাকরির কথা বলি। তোর উপর খেয়ে যাওয়ার আমার কোনো ইচ্ছে নাই।"

আম্মার চোখে টলটলে পানি এসে গেছে। মুহূর্তেই সে পানি চোখের পাতার এক ঝটকায় গাল বেয়ে পড়তে লাগলো। আম্মা সে পানি কাপড়ের আঁচলে মুছে, আবার ঠান্ডা গলায় বলতে লাগলেন,

"আজ চেয়ারম্যান তোর আব্বাকে বলে দিয়েছে, তার কাছ থেকে যে এক লাখ টাকা ধার নেওয়া হইছে, ঐটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেরত দিতে হবে। তার কী যেন দরকারি কাজে লাগবে। তোর বাবা ঘরে ফিরে চিন্তায় বিবর্ণ হয়ে আছেন।"

এই কথা বলে আম্মা আবার কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছে, কুপি নিয়ে চলে গেলেন। আর বাস্তবতার জগতে আমায় চুবানি দিয়ে গেলেন।

উপলব্ধি করলাম বালিশে কয়েক ফোঁটা চোখের পানি ঝরে, তা বিলের নতুন জোয়ারে ওঠা পানির মতো ছড়িয়ে পড়ছে অনেকটা জুড়ে।

আম্মা আসলেই আমাদের অনেক ভালোবাসেন, কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না। তিনি যতই রেগে কথা বলুক তার ভেতর কোনো মায়া লুকিয়ে থাকে। তার ওপর এতো রাগ দেখিয়ে আমার ঘর থেকে নেমে যাওয়া ঠিক হয়নি। যাই হোক, এখন চাকরির ব্যাপারে নিজেকে অনেক তাগিদ দিতে হবে।
টিনের চালে স্বল্প সময়ের জন্য বৃষ্টির ফোঁটা খেলে গেলো। আকাশে একটু পরপর বজ্রপাতের হুংকার। এর মধ্যে কখন যে চোখ ঘোলাটে হয়ে এলো...

***

সাঝ সকালে আম্মার জোর গলায় চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেলো। ঘুম-ঘুম চোখে বললাম,

"কি হইছে?"

"তোর চাচী অনেক কাহিল। তোর আব্বাকে খাদিজা ফোন করে জানালো, তাড়াতাড়ি চল।"

আম্মার কথার মধ্যে আতংকের ছাপ। চাচী চাচাতো বোনের বাড়িতে থাকে বিদায়, এখন দুই গ্রাম পারি দিয়ে তাদের বাড়িতে যেতে হবে। আব্বা আগে থেকেই পাশের বাড়ির ফারুকের ভ্যান ঠিক করে, উঠানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। শিলা আর কায়েস তড়িঘড়ি করে রওনা হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর সবাই ভ্যানে চেপে বসলাম আর ভ্যান চলতে লাগলো। একদিনের বৃষ্টিতে রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে আছে। কখনো ভ্যান থেকে নেমে হাঁটতে হয়। পাকা রাস্তায় উঠার পর ভ্যান সমান তালে চলতে লাগলো। কারো সাথে কারো কথা নেই। একমাত্র ভ্যানের প্যাডেলের শব্দ ছাড়া কিছুই শোনা যায় না।

সূর্য পূর্ব আকাশে মৃদু আলো ছড়িয়ে জানালো, এ বাড়ি পৌঁছাতে আমাদের অনেক দেরি হলো। বাড়ির উঠানে কয়েকটা চেয়ার, সেখানে কয়েকজন মুরুব্বি বসা। মুরুব্বিদের সামনে বাড়ির উঠান দিয়ে আম্মা আর শিলার যাওয়া বারণ। তাই তারা পিছনের দিক দিয়ে গেলো। আমি, কায়েস আর আব্বা উঠানের মাঝখানে যাওয়াতে কয়েকজন আব্বার সাথে কথা বিনিময় করে তাকে বসতে দিলো। আমি আর কায়েস দিশেহারা কচুরিপানার মতো তাদের পাশ কাটিয়ে ঘরের সামনে গেলাম।

ঘরের সামনে থেকে গুনগুনিয়ে কারো কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বুঝতে বাকি রইলো না, এই দুনিয়ার কোলাহল থেকে আল্লাহ্ এক বান্দাকে মুক্তি দিলো। এখন সাড়ে তিন হাত মাটি তাকে সাধরে নিবে। আম্মা আর শিলা সেখানে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে খাদিজা আপার জোর গলার চিৎকার। মনে হলো এতক্ষণ এই কান্না তাদের শোনানোর জন্য জমিয়ে রাখা হয়েছে। খাদিজা আপার কান্নার সাথে বাড়ির পাশের ঝি-বউদের হায় হুতাশ। আমারও বুক ফেটে কান্না আসছে, কিন্তু তা বাইরে আছরে পড়ছে না। চাচির স্মৃতি আমার তেমন কিছু মনে নেই। শুধু আফসা মনে আছে মা যখন মারা যায় তখন তিনি আমাকে কয়েক দফা ঘুম পারানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। বড় হয়ে আমি চাচীকে বিছানায় পরে থাকতেই দেখেছি।

চাচী মারা গিয়ে বেঁচে গেছেন। কতকাল আর অজানা অসুখ ভোগ করবেন। কয়েকবার চিকিৎসার জন্য তাকে শহরে নেওয়া হয়েছে। কোনো ডাক্তার ভালো চিকিৎসা দিতে পারেনি, তবে দফায় দফায় এক গাদা ঔষধ লিখে দিতে ভুল করেনি। আর উন্নত চিকিৎসা দিতে বড়ো হাসপাতালে নেওয়ার মতো সাধ্য আমাদের ছিলো না।
বড়ো চাচা মারা যান খাদিজা আপা জন্মের কয়েক মাস পর। তারপর আব্বা তাদের পরিবারের খরচ চালিয়ে নিতেন। সবকিছু ঠিকঠাক ছিলো, তারপর চাচী অসুস্থ হয়ে বসে গেলেন। খাদিজা আপার বিয়ের পর চাচীর শেষ আশ্রয়স্থল হয় খাদিজা আপাদের বাড়ি।

চাচীর জন্য অন্য জগতের সব আয়োজন সেরে ফেলা হয়েছে। আতর, গোলাপ জল থেকে শুরু করে কাফনের কাপড় পর্যন্ত সব কিছু। চাচীকে কবর দেওয়া হবে আমাদের বাড়ির পারিবারিক কবরস্থানে, তার স্বামীর পাশে। বেঁচে থাকতে তিনি এটা মিনতি করে গেছেন। তার জানাজা পরিয়ে খাটিয়া নিয়ে আমাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ওখানে চাচীর শেষ ঠিকানা কবর তৈরিতে ব্যস্ত আছে কয়েকজন লোক।

চাচীকে আমরা শেষ বিদায় দিয়ে আবার ফিরে গেলাম খাদিজা আপাদের বাড়ি। সন্ধ্যায় আব্বা আর আম্মা বাড়িতে ফেরত গেলেন সঙ্গে কায়েস। কায়েসের সামনে পরীক্ষা, পড়াশুনার চাপ একটু বেশি। তাই আব্বা-আম্মার সাথে কায়েসও বাড়িতে চলে গেলো। খাদিজা আপার মানসিক শক্তি নেই, তাই আমি আর শিলা তাদের বাড়িতে থেকে গেলাম। সে বাড়িতে ফিরোজ ভাইয়ের সাথে গল্প আর ভাগ্নী মুন্নির সাথে দুষ্টুমিতে কয়েকদিন কেটে গেলো। সাথে খাদিজা আপার কিছুটা হলেও মানসিক শক্তির উন্নতি হয়েছে।

রাতে খাবারের সময় ফিরোজ ভাই বললো, "চলো, কাল নদীতে মাছ ধরে আসি।"

ফিরোজ ভাই একজন জেলে। ট্রলার নিয়ে নদীতে মাছ ধরে। ওনার সাথে আরো দুইজন জেলে থাকে, তারা ফিরোজ ভাইয়ের দিক নির্দেশনায় চলে। কয়েকদিন ধরে সে মাছ ধরতে যায়নি। এতেই পারিবারিক খরচ মেটাতে তিনি হিমশিম খাচ্ছেন। তার ওপর আমি আর শিলা তাদের বাড়িতে। আমি কৌতুহল নিয়ে হুট করে বললাম,

"হ্যা, যাবো। কোনোদিন নদী ভ্রমণ করিনি। সাথে নদী ভ্রমণ হবে।"

শিলা বললো, "তোর কি মাথা খারাপ হইছে! বাড়ি যেতে হবে না?"

সাথে সাথে খাদিজা আপা বললো, "কিসের বাড়ি যাওয়া? কয়েকদিন পর যাবি, সাথে আমিও যাবো। মায়ের কবরটা দেখে আসবো।"

শিলা লাজুক ভঙ্গিতে বললো, "তাহলে আমিও নদীতে মাছ ধরতে যাবো।"

আমি বললাম, "থাপ্পড় চিনো? তুই মেয়ে মানুষ নদীতে কাজ কি?"

শিলা মুখ বাঁকিয়ে বললো, "যাযাবরের মধ্যে তো অধিকাংশ মেয়ে, তারাও তো নদীতে থাকে।"

ফিরোজ ভাই হো হো করে হেসে উঠলো। হাসি থামিয়ে বললো,

"মাছ ধরে ফিরতে ফিরতে রাত হবে। ঐ পর্যন্ত তুমি নদীতে রোদের মধ্যে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না। তোমাকে অন্যদিন ঘুরিয়ে আনবো।"

"দুলাভাই, আপনি আমাকে নিবেন না তাই বলেন। মেয়ে মানুষের যদি ধৈর্য কম থাকতো তাহলে তারা এভারেস্ট জয় করতে পারতো না।"

ওর কথায় ফিরোজ ভাই হা করে তাকিয়ে রইলো। আমি ফিরোজ ভাইকে স্বাভাবিক করতে শিলার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম,

"এতো পটপট করছো, বলতো, বাংলাদেশে প্রথম নারী এভারেস্ট জয়ী কে?"

"নিশাত মজুমদার, তার সাত দিন পর এভারেস্ট জয় করেন ওয়াসফিয়া নাজরীন।"

উল্টো ফিরোজ ভাইয়ের মুখ আরো বড়ো হয়ে গেলো। হয়তো মনে মনে ভাবছে, এই মেয়ে কথায় এতো পটু কেন!

এবার খাদিজা আপা শিলাকে শান্তনা দিয়ে বললো,

"তারা মাছ ধরা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, নদীর সৌন্দর্য তেমন একটা দেখতে পারবে না। একদিন তোর দুলাভাইয়ের সাথে আমি, তুই আর মুন্নি ঘুরে আসবো। চরেও ঘুরবো।"

খাদিজা আপার কথা ফেলে না দিয়ে শিলা বললো,

"আচ্ছা, তবে খুব শীঘ্রই যেতে হবে।"

ফিরোজ ভাই আমার উদ্দেশ্যে বললো,

"তাহলে কাল খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠবা। সূর্য ওঠার আগে আমরা ট্রলার ছাড়বো।"

বিষয়টা তার সাথের দুই জেলে বাচ্চু আর হানিফকে আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হলো।

অধ্যায়-৪

ভোরে খাদিজা আপার ডাকে ঘুম ভাঙ্গলো। আমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে ফিরোজ ভাইয়ের সাথে চললাম। নদীর পারে হানিফ ও বাচ্চু ট্রলার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে তারা কি যেন বলাবলি করছিলো আর হাসছিলো। কাছে যাওয়াতে বাচ্চু এক ফালি দাঁত বের করে ফিরোজ ভাইকে বললো,

"তিনি মাছ ধরতে যাবে প্যান্ট শার্ট পরে?"

"সে পেশাদার জেলে না, আমাদের সাথে ঘুরবে।"

"তা তো জানি, একটু মশকরা করলাম।"

হানিফ ট্রলার চালু করলো। ফিরোজ ভাই এক লাফে ট্রলারে উঠে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। ফিরোজ ভাইয়ের হাত ধরে আমি ওঠার সাথে সাথে বাচ্চু ট্রলারটি ধাক্কা দিয়ে বাদুড়ের মতো উঠে গেলো।

ভটভট শব্দ করে ট্রলার চলছে। সূর্য পূর্ব আকাশে উকি মারলো। চারদিগন্তে লাল আভা ছড়িয়ে দিলো আর আমরা তার মধ্যে দিয়ে ধেয়ে চলছি। কিছু দূর যাওয়ার পর ফিরোজ ভাই হানিফ ও বাচ্চুর উদ্দেশ্যে বললো,

"এখন একটা খেও দেওয়া যায়!"

বাচ্চু বললো, "আর একটু পর দেই, নয়া পল্লি পার হইয়া লই।" বাচ্চুর কথা অবজ্ঞা না করে ফিরোজ ভাই এখানে খেও না দিয়ে নয়া পল্লির পর দিতে রাজি হয়ে গেলো।

কয়েক ঘণ্টা পর নয়া পল্লি পার হইলাম। বাচ্চু ও হানিফ জাল ফেলতে লাগলো আর ফিরোজ ভাই স্বল্প গতিতে ট্রলারটি নিয়ন্ত্রণ করছে।

জাল টেনে ট্রলারে উঠানোর পর কয়েকটা পোয়া মাছ ছাড়া কিছুই ধরা দেয় নাই। হানিফ রেগে-মেগে বাচ্চুর দিকে চেয়ে বললো,

"নয়া পল্লি দেখছোটা কি? এখানে তোর হউর বাড়ি! মাছ এখানে তামাশা করে?"

বাচ্চু হানিফের কথায় কোনো রকম প্রতিবাদ করলো না। সে জাল গোছানোর কাজে গভীর মন দিলো। হানিফ আবার জাল গুছায় আর ম্যানম্যানিয়ে বলতে থাকে,

"ফিরোজ ভাইয়ের কথায় আগের জায়গায় খেও দেওয়াটা ভালো ছিলো।"

হানিফ ভাবছিলো ফিরোজ ভাই তার কথায় গলে যাবে। কিন্তু তা হয় নাই, বরং ফিরোজ ভাই একটু কঠিন গলায় বললো,

"আরে থামো তো, এখানে পাই নাই, অন্য জায়গায় পাবো। বাচ্চু কি সবসময় নয়া পল্লি জাল ফেলতে বলে? ওর কথায় সব জায়গায় জাল ফেলেই তো মাছ পাই। আজ ভাগ্যে নাই, তাই পেলাম না।"

ফিরোজ ভাইয়ের কথা শুনে বাচ্চু জোর পেলো, সে এবার লাফ দিয়ে উঠে বললো,

"হানিফ, এর পর তুই জাল ফেলতে বলবি, দেখমু কতো মাছ পাই!"

"আচ্ছা, তোর এই ছাতা-নাতা মাছ থেকে আমি বেশি পামু।"

"কি কইলি, ছাতা-নাতা মাছ! দেখমু আজ দুপুরে কি দিয়া ভাত খাও।"

ফিরোজ ভাই আমার দিকে চেয়ে হাসি দিয়ে বললো,

"এরা এইরকমই এটা-ওটা নিয়ে সারাদিন ঝগড়া করে।"

তার কথা বাচ্চু ও হানিফের কানে পৌঁছেছে, কিন্তু তারা এ কথার ভূক্ষেপ না করে তেজে দুজন দু'দিকে চেয়ে আছে। ফিরোজ ভাই হে হে করে আর একটা হাসি দিয়ে নিজেই ট্রলারটি চালু করে চলতে শুরু করলো।

হানিফ ট্রলার থেকে পানি সেচ দিচ্ছে। বাচ্চু রান্নার কাজে লেগে গেলো। দেখলে বোঝার কোনো উপায় নেই, কিছুক্ষণ আগে এদের

মধ্যে ছোটখাটো এক দফা ঝগড়া হয়ে গেছে। হানিফ বাচ্চুকে বলতে লাগলো,

"তাড়াতাড়ি পাক কর বেটা, সকাল থেকে কিছু খাই না।"

"আমি পাক কইরা তোরে খাওয়ামু না, যা নিজে পাক কইরা খা।" ফিরোজ ভাই বললো, "আহা হানিফ, তুমিও! দেখতে আছো ও পাক করতেছে। তার মধ্যে এই কথাগুলো বলে কি লাভ? ওর কাজ ওরে করতে দাও।"

বাচ্চু বললো, "যা কও ফিরোজ ভাই, আইজ হানিফরে ভাত দিমু না।"

ফিরোজ ভাই হাসতে হাসতে বললো, "আচ্ছা ঠিক আছে, দিমু না। আমারও পেটে খুব ক্ষুধা লাগছে, তাড়াতাড়ি রান্না কর।"

রান্নার ধোঁয়া আর মেশিনের কালো ধোঁয়া মিলেমিশে একাকার। আর ট্রলারের পাখার বারিতে পানি এলোমেলো করে দিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। এরকম নদী ভ্রমণ করি নাই কখনো। আমার কাছে আজকের দিনটার সবকিছু ভালো লাগছে। এমনকি বাচ্চু আর হানিফের ঝগড়া শুনতেও ভালো লাগছে। শিলা আসলে ও অনেক আনন্দ করতো। ছোটবেলা বাড়ির পাশের উত্তর দিকে বিলে যখন পানি উঠে সব তলিয়ে যেতো। এমনকি আউশের ক্ষেত মাথা চুবানি খাইতো। তখন আমি আর শিলা কলা গাছ দিয়ে ভেলা বানিয়ে সারা বিল ঘুরতাম। যখন ঘরে ফিরতাম আব্বার মার খাইতাম আর বলতাম আর কখনো যাবো না। কিন্তু তার পরের দিন আব্বার মারের দাগ না গেলেও স্মৃতি থেকে মুছে আবার সেই বিলে যেতাম। ঐ সময় আমরা সেই বিলকে বিশাল নদী ভাবতাম। আর এখন এই বিশাল নদী আমাকে সেই স্মৃতি বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে।

বাচ্চু আর হানিফের মাঝে আবার ঝগড়া শুরু হলো। এবার ঝগড়া বাঁধছে ভাতের মাড় কে ফেলবে। বাচ্চু হানিফকে বলছে,

"আমি ফেলতে পারি না, তুই ফেল।"

হানিফ একটা ছুতো দিয়ে বসে আছে। বলছে, "দেখছো না জাল

গুছাই।"

আমি বললাম, "আচ্ছা, আমি ফেলে দেই।"

ফিরোজ ভাই অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো,

"তুমি ভাতের মাড় ফেলতে পারো?"

ফিরোজ ভাই এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন এভারেস্ট জয় করার পরিকল্পনা করছি।

"জি, মেসে থাকতে শিখে নিয়েছি, যেদিন বুয়া আসতো না ঐদিন আমাদের রান্না করতে হতো। তাই ভাতের মাড় তো ফেলতে হতো!"

"ও এই কথা, তাহলে আজকে তুমি ভাতের মাড় ফেলো আর বাচ্চু আর হানিফকেও শিখিয়ে দাও। হা হা হা।"

আমি কৌতূহল মেটাতে জিজ্ঞেস করলাম,

"তাহলে এতদিন কে ভাতের মাড় ফেলতো?"

বাচ্চু মনে হয় এই প্রশ্ন পাওয়ার আশায় খাপ পেতে বসে ছিলো। সুযোগ পেয়ে দেরি না করে ঝটপট বলে দিলো,

"হানিফ ফেলতো, এখন কান চোরামি কইরা বইসা আছে।"

"চেষ্টা করলে তো আপনিও পারবেন।"

"আমি এসব ফেলতে পারি না, ডর করে। আমাগো গ্রামের এক মাইয়ার ভাতের পাতিল পায়ের উপর পইরা পা পুরে গেছে।"

"সাবধানে করলে কোনো ভয় নাই, এই দেখুন আমি কিভাবে ফেলছি।"

ভাত খাওয়ার জন্য ডাক এলো। নদীর পানিতে হাত ধুয়ে সবাই থালা নিয়ে বসে আছে। ফিরোজ ভাই ট্রলারটি নিয়ন্ত্রণ করছে। আমি তাকে বললাম,

"আপনি খাবেন না?"

মেশিনের শব্দে আমার কথা তার কান পর্যন্ত যায় নি। আবার জোরে ডাক দিয়ে বললাম। এবার তার কান পর্যন্ত পৌঁছাইছে। উত্তর আসলো,

"তোমরা খাও, তারপর খাবো।"

বাচ্চু বললো, "সে সব সময় দেরিতে খায়। আমাগো আগে খাইতে বলে।"

আমি গপগপিয়ে খেতে লাগলাম জালে পাওয়া পোয়া মাছ আর আলু তরকারি দিয়ে ভাত। বাচ্চু আর হানিফ খাওয়ায় ব্যস্ত। এখন খাওয়া ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো খেয়াল নেই তাদের কাছে। হানিফ আমাকে বললো,

"খাওনটা অনেক মজা হইছে তাই না?"

আমি হ্যা সূচক মাথা নাড়ালাম। আবার বলতে লাগলো,

"বাচ্চু অনেক ভালো পাক করতে পারে। ফিরোজ ভাই বলে ওর হাতে জাদু আছে।"

বাচ্চু বললো, "এহহ আইছে, পাম দিতে, তাড়াতাড়ি খাইয়া মেশিনের কাছে যা, ফিরোজ ভাই খাবে।"

***

হানিফ ট্রলার চালাতে চালাতে একটা চড়ে নিয়ে ঠেকালো। ততক্ষণে ফিরোজ ভাইয়ের খাওয়া শেষ, উনি বসে বসে জাল গোছাচ্ছিল। হানিফ ট্রলার থেকে চড়ে নেমে সোজা বরাবর দৌড়াতে লাগলো। ফিরোজ ভাই ডাক দিয়ে বললো,

"কিরে হানিফ, কই যাও?"

কে শুনে কার কথা, হানিফের দৌড় থামছে না। বাচ্চু বললো,

"হালারপুতে বাড়ি থেকে কাম সাইরা আয় না। আজেবাজে জায়গায় ওনার পেটে নাড়া দেয়।"

বাচ্চুর কথা শুনে আমি আর ফিরোজ ভাই হাসি থামিয়ে রাখতে পারলাম না। বুঝলাম, হানিফ আসলে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেছে।

আমাদের হাসিতে বাচ্চু একটু শায় পেয়ে আবার ডাক দিলো,

"কিরে হানিফ হইছে?"

জঙ্গল থেকে হানিফের ডাক আসলো,

"এতো তাড়াহুড়া কিসের? তোর হউর মরছে নাকি?"
তাদের কথায় আবার হাসি চেপে রাখতে পারলাম না।

হানিফ ফিরে এসে ট্রলার চালু করে এগোতে লাগলো। এমন ভাব যেন বিশ্বজয় করে এসেছে। ফিরোজ ভাইয়ের জাল গোছানো শেষ। সন্ধ্যার দিকে আর একটা খেও দিবে, তারপর যে মাছ পাবে সেগুলো ময়নার হাটে বিক্রি করে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হবে।

সারাদিন ট্রলারের ভটভট শব্দ শুনে আসছি। এখন কি কারণে যেন এই শব্দটা খুব বিরক্ত লাগছে। এই শব্দের সাথে আরো একটি শব্দ যোগ হলো বাচ্চু ট্রলার থেকে ছফছফ করে পানি সেচ দিচ্ছে। আমি সামনে বসে নদী ও পাশের চরগুলোর সৌন্দর্য উপভোগ করছি।
চড়ে অনেকগুলো মহিষ একসাথে হেঁটে যাচ্ছে, পিছনে রাখাল ছেলে। মহিষের পাগুলোর দিকে চাইলে মনে হয় কোনো যুদ্ধে সৈন্যরা তাদের শত্রুর দিকে ধেয়ে চলছে। দূরে পাহাড়ের মতো উঁচুনিচু গাছের সারি। সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ছে। নদীর পানি গাঢ় লাল হয়ে উঠলো, যেন কেউ আলতা ঢেলে দিয়েছে। প্রকৃতি আমাকে তার রূপ দেখিয়ে প্রেমে ফাঁলার পায়তারা করছে।

এমন সময় বাচ্চু আমার কানের কাছে এসে বললো,
"স্যার, ঐ যে চড়টা দেখতে পাচ্ছেন, ওইটা দিঘির চর। ওখানে আগে আমাদের বাড়ি ছিলো।"
গ্রামের মানুষরা প্যান্ট-শার্ট পরা কাউকে দেখলেই 'স্যার' বলা শুরু করে দেয়। তাই আমার মতো একটা বেকার ছেলেকে বাচ্চু 'স্যার' বলে সম্বোধন করলো।
"ও তাই?"
বাচ্চুর কথার শব্দ নাই। আমি ওর দিকে ঘুরে তাকালাম, ওর চোখে ঝলকানি। এক দৃষ্টিতে দিঘির চরের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি কিছু বলার আগেই বাচ্চু বলতে লাগলো,
"আমি, আমার মা আর আমার একটা ছোট বোন ঐ চরে

থাকতাম। মার একদিন কি যে জ্বর হইলো, টাকা-পয়সার অভাবে শহরে নিতে পারি নাই। ভুগতে ভুগতে মইরা গেলো। ঠিক আপনার চাচীর মতো। তারপর বইনটা আর আমি ভালোভাবে দিন কাটাইতাম। একদিন আমার বইনটা ঘরে ফিরে না। আমি সব জায়গা তন্নতন্ন কইরা খুঁজে দেখছি কিন্তু কোথাও পাই নাই। আমাদের এলাকার রহিম মিয়া একদিন এসে আমাকে কইলো, 'তোমার বইনকে আমি দেখছি। কারা নাকি আমার বইনরে মাইরা গাঙে ফালাইয়া দিছে।' রহিম মিয়া কসম কাইয়া কইলো। ঐ কথা শোনার পর বইনটারে গাঙে কতবার খুঁজেছি, পাই নাই। তারপর ফিরোজ ভাইয়ের সাথে একদিন দেখা হয়, আমি ওনার সাথে জাল বাইতে নাইমা গেলাম, বইনটারে যদি কোনোদিন পাই। প্রতিবার জাল টেনে ওঠানোর সময় ভাবতাম, 'এই বুঝি আমার বোন উঠে এসেছে, তাহলে মায়ের পাশে শুইয়ে দিতে পারবো।' কিন্তু বোন আর উঠে নাই, দাফনকাজও করতে পারলাম না।"
কিছুক্ষণ দম নিয়ে আবার বলতে লাগলো, "আমি আর ঐ দিঘির চরে যাই নাই। তবে মনটা সারাদিন দিঘির চরে পইরা থাকে। ফিরোজ ভাইয়ের এলাকায় কিছু জমি রাখছি। একটা বিয়া করছি। দুইটা বাচ্চা হয়েছে আল্লাহর রহমতে, খুব ভালো আছি।"

বাচ্চুর চোখে পানির জোয়ার উঠেছে। সারাদিন এতো আবেগময় হতে দেখি নাই। আমার বাচ্চুকে কি বলে শান্তনা দেওয়া উচিত বুঝে উঠতে পারছি না। কিছু বলার আগেই বাচ্চু আবার পানি সেচে লেগে গেলো। বাচ্চুর মতো মানুষদের একটা ক্ষমতা আছে, আবেগ এক মুহূর্তে ঝেড়ে ফেলতে পারে। আমি আবার প্রকৃতির প্রেমময় ডাকে সাড়া দিতে লাগলাম।

সূর্য আমাদের থেকে বিদায় নিলো। আর উপস্থিত হলো পূর্ণিমার চাঁদ। পূর্ণিমা ও হারিকেনের আলোতে তিনজনে জাল ফেলার কাজে লেগে গেলো। আর মাঝখানে যোগ হলো বাচ্চু ও হানিফের কথা-কাটাকাটির প্রতিযোগিতা। এতে আমি নিতান্ত দর্শক ও শ্রোতা ছাড়া কিছুই না।

তবে ফিরোজ ভাই তাদের ঝগড়ায় মাঝে মাঝে রেফারির মতো বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে ভুলেন না।

জাল টানা হলো, আমিও মাঝে মাঝে টানছিলাম। জাল ট্রলারে উঠানোর পর সবাই হকচকিয়ে গেলো। জালে প্রচুর মাছ ধরা দেয়। এর আগে নাকি কোনোদিন এক খেও দিয়ে এতো মাছ পায় নাই। হানিফ বললো,

"আল্লাহ রে, এতো মাছ আমার জীবনেও পাই নাই। তাড়াতাড়ি পাটাতনের নিচে ভর।"

ফিরোজ ভাই বললো, "কার পছন্দের জায়গায় খেও দিছি, এইটা কও না।"

বাচ্চু লজ্জা পেলো। তাৎক্ষণিক লাজুক ভাবটা কাটানোর জন্য সে গভীর মনোযোগের ভাব নিয়ে মাছ ট্রলারের পাটাতনের নিচে ভরতে লাগলো।

হানিফ ডাক দিয়ে উঠে বললো,

"ফিরোজ ভাই ডাকাইত মনে হয়।"

ফিরোজ ভাই হতভম্ব হয়ে বললো, "কই? কোথায়?"

দূরে একটি ট্রলার দেখা যাচ্ছে। আমাদের দিকে আসছে। নদীতে জলদস্যুর বড়ো ভয়। এরা আক্রমণ করলে যা পায় সব নিয়ে যায়। মাছের চাহিদা থাকলে তো কোনো কথাই নেই। তাছাড়া এরা জেলেদের মেরে ফেলতেও দ্বিধা করে না। বাচ্চু ও হানিফের মধ্যে ভয়ের ছাপ। ফিরোজ ভাই একটু সাহস সঞ্চয় করে বললো,
"আমাদের দিকে আসবে না, অন্য দিকে যাবে।"
বাচ্চু কাপাকাপা গলায় বললো,

"না, আমাদের দিকে আসছে। এখন আমাগো ট্রলার ছেড়ে দিলেও লাভ হবে না। তারা আমাগো ধরে ফেলবে।"
হানিফও কাপাকাপা গলায় বললো,

"এতো কষ্ট করে মাছগুলো ধরলাম, তা ওরা নিয়ে যাবে!"

এবার কোনো সন্দেহ নেই, ট্রলারটি আমাদের দিকে আসছে। কিছু দূরে থাকা অবস্থায় ট্রলারটির সম্পূর্ণ ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং আমাদের ট্রলারের দিকে ধাবিত করা হয়। তারপর এসে পাশ গেঁড়ে লাগানো হয় ও উপরে থেকে দুইজন আমাদের ট্রলারে ধপাস করে লাফ দিয়ে পড়লো। মুহূর্তে ট্রলারটি ডানে বামে নৃত্য করে গেলো।

তাদের দৈহিক গড়ন হারিকেনের আলোতে পর্যবেক্ষণ করা দায়। তবে দুজনই দেখতে মোটাসোটা। পরনে লুঙ্গি ও স্যান্ডো গেঞ্জি। দুজনেরই লুঙ্গি হাঁটু বরাবর একটু ভাঁজ করে উপরে গিট্টু দেওয়া।

তাদের হাতে বড়ো বড়ো অস্ত্র কাঁধে রেখে সিনেমার স্টাইলে বললো,
"কেউ নাড়াচাড়া করবি না। কি আছে বল!"

একজন আমার দিকে চেয়ে বললো,
"ভাই সাব, আপনি প্যান্ট-শার্ট পরে আছেন কেন? শহর থেকে আইছেন বুজি? ডিজিটাল যুগ, আপনাগো টাকা-পয়সা তো লগে থাকে না। কি কার্ডে ভইরা রাখেন? তো খুচরা খাচরি কিছু আছে?"
আমি বললাম,
"আমি শহর থেকে আসি নাই, গ্রামেই থাকি। নদীতে আমি ঘুরতে এসেছি। আর আপনারা আমাদের কাছে এমনভাবে সবকিছু দাবি করছেন, যেন আপনারা আমাদের কাছে পাওনাদার। এভাবে কতদিন মানুষেরটা খাবেন? নিজেরা কিছু করেন।"

আমার কথায় বাচ্চু ও হানিফ আমার দিকে চোখ বড় করে তাকিয়ে আছে, সাথে ফিরোজ ভাইও। ডাকাতের মধ্য থেকে একজন বললো,
"কি কইলি? একদম কল্লা কাইটা গাঙে ভাসাইয়া দিমু।"
অন্য ডাকাত বললো,
"না, কিছু করিস না। তারে মারলে দেশ থেকে একটা শিক্ষিত বলদ কইমা যাবে।"
ওই ট্রলার থেকে কয়েকজন ডাকাতের হাসির শব্দ আসলো। তাদের

মধ্যে কেউ একজন আমার মুখে টর্চলাইটের আলো ফেলে বললো,

"তোর মতো আমিও শিক্ষিত ছিলাম। চাকরি পাই নাই, মাগার ডাকাতি পেশায় লেগে গেলাম। এখন পেট ভালোই চলছে।"

টর্চলাইটের আলো ছাড়া চারপাশে কিছুই দেখতে পারছি না। ডান হাত কপালের কাছে এনে তীর্যকভাবে রেখে বললাম,

"আপনার যোগ্যতা নেই, তাই চাকরি পান নাই; তাই বলে মানুষের সম্পদ আপনারা লুট করতে পারেন না।"

"তুই কিসের চাকরি করিস রে?"

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো কৃতিত্ব আমার নেই, তাই চুপ হয়ে গেলাম। সে বলতে লাগলো,

"আমরা সরাসরি মানুষের সম্পদ লুট করি বলে লোকে আমাদের ডাকাত বলে, আর যারা কলমের খোঁচায় লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয় তাদেরকে লোকে স্যার বলে।"

ফিরোজ ভাই বললো,

"সারাদিন পর এইমাত্র কিছু মাছ পাইছি, এছাড়া আমাদের কাছে কিছু নাই। আপনাদের ভালো লাগলে মাছ নিয়ে যাইতে পারেন। আমাদের ছাইড়া দেন।"

তার কথা শুনে এক ডাকাত ট্রলারের পাটাতনের তক্তা সরিয়ে বললো,

"মাছ তো বহুত পাইছো, কিন্তু এখন বাজারে চাহিদা কম। আমাগো নগদ টাকা দরকার।"

অন্য ডাকাত বললো,

"এদের কাছে যখন কিছুই পাই নাই, একটা লাশ ফেলে চলে যাই।"

তার কথা শুনে বাচ্চু ও হানিফ সোজা পানিতে লাফ দিয়ে ছপছপ শব্দ করে সাঁতরে কিছু দূরে নদীর তীরে উঠেছে। আর ওখান থেকে আমাকে আর ফিরোজ ভাইকে ডাকাডাকি করছে,

"তাড়াতাড়ি চইলা আহেন।"

ততক্ষণে ডাকাতের দল আমাদের হাত ধরে ফেলছে। এখন নির্বাকার হয়ে থাকা ছাড়া কোনো উপায় নেই। ফিরোজ ভাই বললো,

"দেখুন, আমাদের ছেড়ে দিন। আমাদের মেরে আপনাদের কোনো লাভ হবে না।"

"লাভ দিয়ে কি করমু? আজ সারাদিন কোনো মক্কেল পাই নাই। তোদের একটা লাশ এখানে ফেলে যাই নইলে রাতে ঘুম হবে না।" আমি কিছু না বলে নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এখন দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া কিছু করার নাই। এরা কতটা নিষ্ঠুর! মানুষ না মারলে নাকি এদের ঘুম হয় না।

ফিরোজ ভাই একটু পর পর হেঁচকি তুলছে। আগে মনে হয় তাকে মারবে এটা সে নিশ্চিত। ডাকাতের সরদার আমার দিকে তাকিয়ে বললো,

"তোর চেহারায় বড় মায়াবী ভাব, তোকে মারতে একটুও ইচ্ছে করতেছে না। যা, তোকে ছেড়ে দিলাম।"

উনি আমাকে মিথ্যা বলে খানিকটা মজা নিলো কিনা বুঝতে পারলাম না। তারপরও বুকের ছাতিটা ফুলে উঠলো। বুকভরা একটা নিশ্বাস নিয়ে ফিরোজ ভাইয়ের জন্য সুপারিশ করতে গেলাম,

"আচ্ছা, ওনাকেও ছেড়ে দিন।"

"হা হা হা, ওনাকে কি মারবো! উনি তো মরার আগেই মরে গেছে।"

এ কথা বলে এক লাফে তাদের ট্রলারে উঠে মেশিন চালু করে ভটভট শব্দ করে এক ঘোলা কালো ধোঁয়া উড়িয়ে চলে গেলো। এখন বুকভরা নিশ্বাস নেওয়া যায়।

ফিরোজ ভাই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। সারাশরীরে শুধু ঘাম, যেন সবেমাত্র নদী থেকে ডুব দিয়ে উঠলো। ফ্যাসফ্যাস শব্দ করে বললো,

"মুন্নিকে দেখবো।"

তাকে কি বলে শান্তনা দিবো বুঝতে পারছি না। জেলে পেশায় ডাকাতদের সামনে পরার অভিজ্ঞতা তার নিশ্চয়ই আছে। এইরকম ভেঙে পড়ার কারণটা আবিষ্কার করতে পারলাম না।
চর থেকে বাচ্চু আর হানিফ সাঁতরে আমাদের দিকে আসছে। ট্রলারে উঠে হানিফ বাচ্চুকে বললো,

"মেশিন চালু কর, তাড়াতাড়ি এখান থেকে যাইতে হবে।"

তাদের ভাবটা এমন যে, আমাদের বাঁচানোর পিছনে সব কেরামতি তাদের। কয়েকবার হ্যান্ডেল ঘুরানোর পর মেশিন চালু হলো এবং দ্রুত গতিতে ট্রলার এগিয়ে চলেছে, যেন ডাকাত দল এখনো আমাদের ধাওয়া করছে। মাছগুলো কি করবে জানিনা। হানিফের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, সে বললো,

"তাড়াতাড়ি ময়নার হাটে গিয়ে বরফ দিয়ে রাখবো, কাল বিক্রি করবো।"

কয়েকঘন্টা পর ময়নার হাটে পৌঁছালাম। এশার আযান অনেক আগেই হয়ে গেছে। হাটে এখন তেমন মানুষের কোলাহল নেই। কাচামালের দোকানিরা দোকান সরাইতেছে আর মাছ বিক্রেতেরা ঠনঠন শব্দ করে জিনিসপত্র গোছাইতেছে। ফিরোজ ভাইকে দেখে তাদের ঠনঠনানি যেনো আরো বেড়ে গেলো। একজন বললো,

"ফিরোজ মিয়া আজ এতো দেরি?"

ফিরোজ ভাইয়ের পক্ষ থেকে বাচ্চু বললো,

"মাছ বিক্রি করতে আসি নাই, বরফ নিতে আসছি।"

"বরফ দিয়ে কি করবা? কাল বেচবা?"

"হুম।"

"কাল খদ্দের পাবা না, তার চেয়ে আমাদের কাছে পাইকারিতে ছাইড়া দাও। কাল ছৈলাপুরে যাবো। ঐ হাটে বেচতে পারমু।"

বাচ্চু সম্মতির আশায় ফিরোজ ভাইয়ের দিকে তাকালো। সে বললো,

"বরফ কিনতেও তো মেলা টাকা যাইবো। আর কাল কেমন খদ্দের

পাই তাও জানি না। তার চেয়ে এদের কাছে পাইকারিতে ছেড়ে দেই।"

বাচ্চু লোকটার দিকে তাকিয়ে বললো,

"হ, বেচমু, কেডা কিনবা?"

সে তার পাশে কয়েকজনের দিকে তাকিয়ে বললো,

"তোমরা কেউ কিনবা? না আমি একা কিনবো?"

একজন বললো, "দরদাম করেন দেখি কেনা যায় কিনা।"

বাচ্চু ফিরোজ ভাইয়ের কাছে দামের কথা জানতে চাইলো। ফিরোজ ভাই বললো,

"দুই হাজার টাকা বলে দে।"

বাচ্চু তাদের কাছে বললো,

"দুই হাজার টাকা দিয়ে নিয়ে যাও।"

লোকটি পাটাতনে চোখ বুলিয়ে বললো,

"এই মাছ দুই হাজার টাকা! পাগলামি করেন? একদাম দেড় হাজার দিমু।"

"না, দুই হাজার।"

"না, দেড় হাজার দিলে আছি, নইলে যাই।"

দাম কশাকশির পর উভয়পক্ষ আঠারো শোতে রাজি হলো। সে ট্রলার থেকে মাছ নিয়ে চলে যাচ্ছে। যাওয়ার পর হঠাৎ একজন এসে বললো, "ঠকছেন মিয়া, এই মাছের দাম আরো বেশি।"

ফিরোজ ভাই তাকে কিছু বললো না, সে হানিফকে ট্রলার চালু করতে বললো।

অধ্যায়-৫

খাদিজা আপা কুপি নিয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের আগমনী বার্তা তার কাছে গেলো কিভাবে বুঝলাম না।

"আজ এতো দেরি হলো কোনো?"

ফিরোজ ভাইয়ের কোনো উত্তর নেই। আমি বললাম,

"মাছ বিক্রি করতে সময় হয়ে গেছে।"

প্রসঙ্গ পালটাতে হুট করে বললাম,

"মুন্নি কই?"

"ঘরে শীলার সাথে দুষ্টুমি করছে।"

ঘরে যাওয়ার সাথে সাথে ফিরোজ ভাই মুন্নিকে কোলে নিয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। মুন্নি নিরুপায় হয়ে শুধু তার দিকে তাকিয়ে আছে। খাদিজা আপা আমাকে জিজ্ঞেস করলো,

"কি হইছে?"

"কিছুনা, পেটে খুব ক্ষুধা লাগছে, ভাত খাবো।"

"কিছু তো হইছে, এমন করছে কেনো?"

আমি কি বলবো বুঝতে পারছি না। সত্যিটা বলে দিবো নাকি পরে এটা নিয়ে ঝামেলা হবে? ধ্যাত বলে দেই!

"ডাকাতের আক্রমণের শিকার হইছিলাম, আমাদের ধরতে পারেনি, জোরে ট্রলার চালু দিয়ে এসে পড়েছি।"

একটু মিথ্যা বললাম, নইলে একটার পর একটা প্রশ্ন করেই যাবে। কোন ডাকাত? দেখতে কেমন? হাতে কি ছিলো? এই সেই! মিথ্যা বলায় এই জবানবন্দি থেকে বেঁচে গেলাম।

"ওহ, হাত মুখ ধুয়ে খেতে আয়।"

শিলার ডাকাতের ব্যাপারে কোনো কৌতূহল দেখলাম না। যে কোনো কিছুতে ওর কৌতূহল অতিরিক্ত। আজ ওর এই পরিবর্তন আমাকে অবাক করছে। নদীতে ঘুরতে যেতে পারেনি, তাই হয়তো অভিমান করে আছে।

ভাত খাওয়ার সময় শিলা বললো,

"ভাইয়া কালকে বাড়ি যাবো, খাদিজা আপাও যাবে।"

"ওহ," ফিরোজ ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললাম,

"আপনিও চলেন আমাদের সাথে।"

"না ব্যাটা, বাড়িতে অনেক কাজ, তাছাড়া বাচ্চু আর হানিফের সাথে থাকতে হয়। তোমরা যাও। আমি দেখি কয়েকদিন পর আসতে পারি কিনা।"

মুন্নি মিনমিন করে বললো,

"আব্বু তুমিও তলো, আমার এতা ভাদো লাগবে না।"

ফিরোজ ভাই হেসে বললো,

"না আম্মু তুমি যাও, তোমার আম্মুর কাছে টাকা দিবো মজা কিনে খাবে।"

"আতছা," শিলার দিকে ফিরে বললো,

"আনতি তুমি আল আমি থাবো আর তাউতে দিবো না।"

ওর এই ভবিষ্যত চিন্তা দেখে কেউ হাসি থামিয়ে রাখতে পারলো না।

শিলা বললো, "আচ্ছা সোনা, তুমি আর আমি খাবো, আর কাউকে দিবো না। এখন তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে শুয়ে পরো।"

"আজ গল্প তুনাবা না?"

"হুম, শুনাবো, এখন খাও।"

শিলার কথা শুনে মুন্নির খাওয়ার প্রতি দায়িত্ব বেড়ে গেলো। তাড়াহুড়ো করে মুখে দিচ্ছে। এক পর্যায়ে মুখ ভর্তি করে বসে রইলো।

***

"কিরে, এখনো ঘুমাস ওঠ।" শিলার ডাকে ঘুম ভাঙ্গলো। কয়েকদিন ধরে খুব ভোর ভোর জাগতে হয়। ঘুম চোখে বললাম,

"আজ আবার কি?"

"বাড়ি যেতে হবে না? তাড়াতাড়ি রওনা কর। খাদিজা আপা রেডি হইতাছে।"

"বাড়ি যাবো বুঝলাম, এতো ভোরে যেতে হবে কেনো?"

"তোর কথার উত্তর আমার কাছে নাই, রওনা করতে বলছি, রওনা কর।"

পুকুরে হাত মুখ ধুয়ে আসলাম। তারপর প্যান্ট-শার্ট গায়ে জড়াচ্ছি। খাদিজা আপাকে ডাক দিয়ে বললাম,

"ফিরোজ ভাইয়া কই?"

ওইপাশ থেকে উত্তর আসলো, "মাছ ধরতে গেছে।"

সকালের পানি ভাত পেটে পুষে ঘর থেকে বের হলাম। খাদিজা আপার কোল থেকে মুন্নিকে আমি কোলে নিলাম। শিলার হাতে ব্যাগ। ব্যাগ নিয়ে ওর হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে দেখে খাদিজা আপা ওর থেকে নিয়ে নিলো।

"একটা গাড়ি দরকার।"

আপা বললো,

"পাঁচ মিনিট হাঁটলে সামনে বাজার। ওখানে গাড়ি পাওয়া যাবে।"

আশি টাকা দরে একটা ভ্যান ঠিক করলাম। প্রথমে একশো বিশ টাকা চাইছিলো। কষাকষির পর আশি টাকায় নামলো।

বাড়ি যেতে যেতে প্রায় দুপুর। ঘরে ঢোকার আগে খাদিজা আপা আম্মাকে সাথে নিয়ে চাচীর কবর দেখতে চলে গেলো। নিশ্চয়ই সেখানে গিয়ে কান্নাকাটির জো বসাইয়া দিবে।

বেচারা সবুজের সাথে কতোদিন আড্ডা হয় না। আমি সবুজের বাড়িতে যাবো সিদ্ধান্ত নিলাম। না, এখন যাওয়া ঠিক হবে না। এখন প্রায় দুপুর বিকালে যাবো। এখন মুন্নির সাথে দুষ্টুমি করে সময় কাটাবো। বাড়ি থেকে মুন্নি যে সাজুগুজু করে এসেছে, তা শিলার পছন্দ হয় নাই। সে তার রুমে বিউটি পার্লার বানিয়ে ফেললো। মুন্নি সাময়িক সময়ের জন্য কাস্টমার। আমি শিলাকে টিটকারি দিয়ে বললাম,

"মুন্নি যা খাবে, তার ভাগ পাওয়ার লোভে সাজাইয়া দিচ্ছো?"

"লাথি দিবো, যাহ এখান থেকে।"

আমি আবার বললাম, "লোভী।"

এবার রাগ চরম পর্যায়ে, এক ঝটকায় রুমের দরজা আটকিয়ে দিলো। আমি বুঝতে পারছি শিলা মুন্নিকে নিয়ে বান্ধবীর বাড়িতে ভ্রমণে যাবে। তাই রাজকুমারী বানাচ্ছে।

বিকালে সবুজের বাড়িতে যেতে লাগলাম। পথেই সবুজের সাথে দেখা ও একটি কলা গাছ কাটতেছিল। গাছে কলা পাক ধরছে তাই। সবুজের মুখে শুনলাম আর এক কাহিনী। গতকাল থেকে চা দোকানদার হারুন মামার নবম শ্রেণীতে পড়ুয়া মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রামে হৈচৈ পড়ে গেছে। কেউ বলছে কেনো ছেলের সাথে পালিয়ে গেছে, কেউ বলছে বাবা-মায়ের সাথে রাগ করে কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে গেছে। কিন্তু সব আত্মীয়ের বাড়িতে খোঁজ নেওয়া হয়েছে, কারো বাড়িতে নেই। কেউ বলে ফেলছে ফারজানার মতো কিছু হবে। কৌতূহলী মানুষ ফারজানাকে যে নদীতে পাওয়া গেছে, সে নদীর পারে দাঁড়িয়ে থাকে।

ফারজানার কাহিনি থেকে শিক্ষা নিয়ে হারুন মামা তাড়াতাড়ি থানা পুলিশকে খবর দিয়েছে। তারা চারদিকে লোক লাগিয়েছে। সবুজের মুখে এইরকম কথা শোনার পর হারুন মামার প্রতি অনেক মায়া জন্মালো। বেচারার আর কোনো সন্তান নেই, একমাত্র মেয়ে। সে দিনও আমাদের কাছে তার মেয়ে নিয়ে স্বপ্নের কথা বললো, নামি-দামি ছেলের সাথে বিয়ে দিবে, ঘর সংসার করবে। তার মেয়েকে একটা

ভালো জায়গায় বিয়ে দিতে পারলেই সে খুশি। মনে মনে হারুন মামার মেয়ের জন্য প্রার্থনা করতে লাগলাম, আর ভাবলাম কোনোরকম যেন ফারজানার মতো না হয়।

কয়েকদিন কেটে গেলো, হারুন মামার মেয়ের কেনো খোঁজ নেই। এর মধ্যে একবার তার বাড়িতে গেলাম। তাদের মানসিক অবস্থা খুবই খারাপ। হারুন মামার স্ত্রী বারবার বেহুশ হয়ে পড়ে। পাড়ার ঝি-বউরা তাকে শান্তনা দিচ্ছে। হারুন মামার চোখের পানি থামে না।

***

পকেটে ফোনের রিংটন বেজে উঠলো। অপরিচিত নম্বর। কানের কাছে নিয়ে সালাম দিলাম। ওপাশ থেকে একজন নারী কণ্ঠে বললো,

"আমাদের কোম্পানিতে আপনি চাকরির জন্য আবেদন করছিলেন। তো আপনি আমাদের কোম্পানিতে প্রাথমিক পর্যায়ে নির্বাচিত হয়েছেন। এখন আপনার ছোট্ট একটা ভাইভা নেওয়া হবে। যদি আমাদের অফিসে আসতে পারেন!"

কথাটা শুনে আমার বুকে দক্ষিণা নরম হাওয়া বয়ে গেলো। এবার যদি চাকরিটা হয়েই যায়! তাদের কাছ থেকে তারিখটা জেনে নিলাম। তারিখ অনুযায়ী আগামী কালই ঢাকা রওনা হবো। আগে যে মেসে থাকতাম ওখানে এক ছোট ভাই আছে। কাল রাত ওদের মেসে থাকবো।

অধ্যায়-৬

স্টেশনে সকাল নয়টার বাস ধরবো এই লক্ষ্য নিয়ে খুব সকালে ঘর থেকে বের হলাম। গিয়ে পৌঁছালাম সাড়ে আটটায়। বাস ছাড়তে এখনো আধ ঘন্টা বাকি, তাই স্টেশনের পাশের চোকানে চায়ের সাথে সিগারেট ফুঁকতে লাগলাম।

বাসের ইঞ্জিন থেকে গড়গড় শব্দ ভেসে এলো। কোনোমতে চায়ের কাপে কয়েকটা চুমুক দিয়ে সিগারেট থেকে কয়েকবার মুখে ধোঁয়া নিয়ে কুন্ডলী পাকিয়ে ছেড়ে পায়ের তলায় পিষ্ট করে বাসে উঠলাম। বাসে দুইজন লোক ছাড়া কেউ নেই। দুজনের মধ্যে এক ড্রাইভার আর এক আমি। আবার ইঞ্জিন থামিয়ে দেওয়া হলো। আমি জিজ্ঞেস করায় সে বললো,

"বাস ছাড়তে এখনো দেরি।"

"তাহলে এখন স্টার্ট দিলেন কেন?"

"ইঞ্জিন গরম করছি।"

নিজের বোকামি বুঝতে পেরে চুপচাপ বসে ছিলাম। সিগারেটের উপর মায়া লাগলো। এভাবে প্রায় পূর্ণ সিগারেট পায়ের নিচে পিষ্ট! তখন মনে পড়লো দোকানদার মামার বিল মেটাতে ভুলে গেছি। দোকানের কাছে গিয়ে দেখলাম উনি স্বাভাবিকভাবেই বসে আছে। ওনার টাকা না দিয়ে মহৎ কেউ পালাচ্ছিলো সেদিকে ওনার খেয়াল নেই। আমাকে দেখে মুচকি হাসি দিয়ে বললো,

"ফিরে এলেন কেনো ভাই সাব? আরে ভয় নাই, বাস আফনেরে রাইখা যাইবে না।"

"আপনি আমার কাছে চা আর সিগারেটের টাকা পাবেন।"

"ওহ তা জানি।"

"আচ্ছা, আপনাকে টাকা না দিয়ে চইলা যাইতেছি, আপনি আমার

পিছু নেন নাই কেনো?"
সে হা হা করে হেসে উঠলো। বললো,

"আমি তো জানি বাস এখন ছাড়বে না, তাছাড়া এই কয়টা টাকার জন্য পিছু নিবো কেন? আপনি যে মোবাইল রাইখা গেছেন, ঐটাতেই তো অনেক লাভ ছিলো।"

কথাটা বলেই সে পাশে রাখা মোবাইলটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো। আরে, এটা তো আমার মোবাইল! এবার আরো একবার বোকামি টের পেয়ে নিজের উপর রাগ চরম পর্যায়ে। এই রাগ কমাতে আরো একটা সিগারেট দরকার।

সিগারেটে আগুন দিয়ে টুলের উপর বসে পরলাম। দোকানদার মামা বললেন,

"তা ভাই সাব, কই থেকে আসলেন?"

"হাশেমপুর।"

"হাশেমপুর!"

উনি এমন ভাব করলেন যেন আমি আমার গ্রামের নাম বলিনি, ওনার মাথায় বাঁশ দিয়ে আঘাত করেছি। তবে তার চোখে কৌতূহলের মাত্রাটা বেশি। আবার বললেন,

"শুনলাম হাশেমপুরে নাকি মেয়েছেলে গায়েব হয়ে যায়, কথাটা সত্যি?"

"হুম।"

আমার এই সংক্ষিপ্ত উত্তর উনি আশা করেননি। ভেবেছিলেন বিস্তারিত সব খুলে বলবো। তার আগ্রহ মেটাতে আবার জিজ্ঞেস করলো,

"কারো কোনো সন্ধ্যান পাওয়া গেছে?"

কিছু বললাম না, চুপচাপ সিগারেট ফুকতেছিলাম। আবার ওনার কথা শোনা গেলো। যেন নিজেকে নিজে বলতেছে,

"ইশরে কতগুলো মেয়েছেলে এভাবে পর পর গায়েব হইয়া যায়, দিনকাল বড়োই খারাপ।"

আমি বললাম,

"কতগুলো না, দুইজন। কয়েকদিন আগে একজন আর দুই বছর আগে আরেকজন গায়েব হইছিলো, পরে তার লাশ পাওয়া গেছে।"

"ওহ, এদিকে সবাই বলাবলি করছে, দিনদিন মেয়েছেলে গায়েব হয়। অনেকে বলছে ঐ গ্রামে ভূত থাকে। এটা আমিও বিশ্বাস করি। দুইশো বছর আগে ঐ গ্রামে একটা হিন্দু বাড়ি ছিলো। গ্রামের লোকেরা নাকি অন্যায়ভাবে তাদের তাড়িয়ে দেয়। তাদের একটা কিশোরী মেয়ে ছিলো, নাম পার্বতী। গ্রামের যুবকরা সেই মেয়েটিকে ধর্ষণ করে মেরে ফেলে। সেই থেকে ঐ গ্রামে ভূত ঘুরে। অনেক মানুষের চোখেও পরেছে। আমার দাদা একদিন হাট থেকে ঐ গ্রাম দিয়ে ফিরছিলেন, তখন তার সামনে পরেছিলো বিশাল দেহ, সাদা কাপড় পরা, চোখে আগুনের ফুলকি। দাদা ওখানেই বেহুশ হয়ে পড়ে। হুস হওয়ার পর তিনি টানা সাত দিন কারো সঙ্গে কথা বলেননি।"

তার কথা শুনে আমার বিশ্বাস হলো না। গ্রামের লোকেরা বলবে এক, শুনবে দুই, অপরজনের কাছে বানিয়ে বলবে তিন। তাছাড়া আমি আব্বার মুখ থেকে গ্রামে ভুতের কোনো কাহিনি শুনিনি।

সিগারেট শেষ করে বিল মিটিয়ে বাসে গিয়ে বসে পরলাম। দোকানে বসে থাকলে আরো অনেক আজব কাহিনি শুনতে হবে। তার চেয়ে বাসে এই অস্বস্তিকর গরমে ও দুর্গন্ধে বসে থাকা ভালো। দুর্গন্ধ থেকে নিজেকে একটু আড়াল করতে বাসের জানালা খুলে বাইরের দিকে উঁকি মেরে থাকলাম।

বাস ড্রাইভার এসে বাস চালু করে হরেন দিলো। সাথে সাথে পিপীলিকার মতো মানুষ বাসে উঠতে লাগলো। তারা এতোক্ষণ যাত্রী ছাউনিতে বসে ছিলো, কেউ কেউ আমার মতো চায়ের দোকানে ছিলো। চায়ের দোকানে আমার পাশে যে লোকটি আগ্রহ নিয়ে আমার আর দোকানদারের কথা শুনছিলো, সে এখন আমার পাশের সিটে।

হনহন করে বাস চলতে লাগলো। হেল্পার বাসের শরীরে থাপ্পড় দিয়ে ড্রাইভারকে উৎসাহ দেয়। থাপ্পড়ের তালে তালে বাস পক্ষীরাজের মতো ছুটতে থাকে। রাস্তার পাশের গাছগুলো যেন কোথায় ছুটে চলছে। আমি বাসের জানালা দিয়ে চেয়ে বাইরের দৃশ্যগুলো উপভোগ করছি। হঠাৎ পাশের সিটে বসে থাকা লোকটি বলে উঠলো,

"ভাই, আমার মনে হয় দোকানদার লোকটির কথা সত্য। নইলে মেয়েছেলে গায়েব হওয়ার তো কোনো কথা না। হাশেমপুর আমার নানা বাড়ি। আমি মায়ের মুখ থেকেও ঐরকম ভূতপ্রেতের কথা শুনছি।"

এই প্রসঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে না। এড়িয়ে যেতে সংক্ষেপে বললাম, "অ..."

আমার এড়িয়ে যাওয়া সে বুঝতে পারলো। অন্য প্রসঙ্গ টানতে সে বললো, "তা, আপনি কোথায় যাচ্ছেন ভাই?"

"ঢাকার বাসে কি দিল্লি যাওয়া যায়?"

"না, মানে ঢাকা কোন জায়গায়?"

"মিরপুর।"

"কিসের জন্য ভাই?"

"চাকরির ভাইভা দিবো।"

"ওসব ভাইভা টাইভা কিছুনা ভাই। তারা দেখবে কার বাপের কত টাকা, তারপর টাকা চেয়ে বসবে। ঘুষ দিতে পারলে চাকরি হবে, নইলে না। আমার কথা লিখে রাখেন ভাই।"

কিছু লোকের জন্ম হয় এইরকম কথা বলার জন্য। একজন এগিয়ে যেতে চাইলে তাকে উৎসাহ না দিয়ে পেছন থেকে পা টেনে ধরবে। লোকটার কথা শুনে মন ভেঙ্গে গেলো। এখন আর তার কোনো কথা ভালো লাগছে না। তার কথা যাতে আমার কানে আর না আসে, তাই কানে হেডফোন গুঁজে দিলাম।

কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা।
মনে মনে মেলে দিলাম গানের সুরের এই ডানা।

লোকটি আরো কি যেন বলতেছিলো, নিশ্চয়ই কোনো আত্মীয়ের উদাহরণ দিচ্ছিলো। কথা বলতে বলতে আমার দিকে চাইলো এবং আমার অনাগ্রহ দেখে লজ্জা পেলো। লজ্জা আটকাতে আগে থেকে হাতে মোড়ার মতো ভাজ করা পাতলা বইটির ভাজ খুলে পড়তে লাগলো। কোনো এক বিজ্ঞাপনের বই হয়তো।

অধ্যায়-৭

মেসে দূরসম্পর্কের ছোট ভাই রফিক আর একটা ছেলে ছাড়া কেউ নেই। কলেজ কয়েকদিনের জন্য বন্ধ, তাই অন্যরা গ্রামের বাড়িতে গেছে। বাসাটা খুঁজে পেতে একটু কষ্ট হলো। প্রায় দেড় বছর পর এখানে আসছি। সবকিছু বদলে গেছে। মোড়ের পাশে যে দোকানে বসে চা খেতাম আর সিগারেট ফুঁকতাম, সে দোকানটা নেই। তার জায়গা দখল করেছে দৈত্যের মতো বিশাল বিল্ডিং। মুদি দোকানটা ঠিক আছে, তবে মালিকানা ও জিনিসপত্র বদলে গেছে। টিভি, ফ্রিজ ভরপুর। আগে এখানে মধ্যবয়সী এক লোক বসতো। আজ সেখানে ছেলেবয়সী কেউ আছে।

আমার আগ্রহ মেটাতে তাকে জিজ্ঞেস করলাম,

"ভাই, এখানে মিজান মামার দোকান ছিলো, সে এখন কোথায়?"

তিনি একটু বিরক্ত হয়ে বললেন,

"আপনার কি দরকার?"

"প্রায় দেড় বছর আগে এই দোকান থেকে বাকি খেয়েছি। মিজান মামার সঙ্গে আমার ভালোই সম্পর্ক ছিলো। অনেকদিন পরে এলাম, ভাবলাম তার সঙ্গে দেখা করে যাই।"

"আসলে সে প্রায় আট মাস আগে স্ট্রোক করে মারা গেছে। আমি তার ভাগিনা, দোকানের আগের জিনিসপত্র বিক্রি করে এইগুলো নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছি।"

"তার ছেলেমেয়ে নেই?"

"না, কোনো সন্তান ছিলো না। অনেক ডাক্তার-কবিরাজ দেখিয়েছিলো, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। তার মৃত্যুর এক মাস আগে এক ফকিরের ফু নিয়েছিলো। আসলে দেওয়ার মালিক তো আল্লাহ, ফকিরের ফু টু কিছু না। এখন মামী অন্তঃসত্ত্বা। সন্তান আসার খবরও

শুনতে পারেননি। এখন মামী গ্রামে আছেন, মাসে মাসে এখান থেকে কিছু টাকা পাঠাই।"

মিজান মামার মৃত্যুর কথা শুনে মনের ভেতর গভীর দাগ কেটে গেলো। একই জায়গায় কতো কথা বিনিময় করতাম, কেনাকাটার ফাঁকে কত হাসিতামাশা করতাম। আজ বসে তার মৃত্যুর গল্প শুনছি। কান্না আসছে, কিন্তু খুব কষ্ট করে চেপে রাখলাম। পর মানুষের জন্য কাঁদতে হয় না। তাহলে এই শহর খিলখিল করে হাসে। এখানে নিজের জন্য ভাবতে হয়, নিজেকে টেনে নিয়ে যেতে হয়।

***

রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম। রফিকের বিছানায় আমি জায়গা করে নিলাম। সে অন্য কারো বিছানায় শুয়েছে। মজার বিষয় রফিক যেখানে থাকে, একসময় আমি সেখানে থাকতাম। সারাদিন কলেজ, বিকেলে চায়ের দোকানে আড্ডা, সন্ধ্যায় বই নিয়ে একটু বসা। তারপর রাতের খাবার খেয়ে মেস মেম্বারদের সঙ্গে গল্পের আসর। গল্প করে এইখানে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়তাম। পরেরদিন সকাল আবার একই রুটিন।

"ভাইয়া ওঠেন, আপনার নাকি সকাল দশটায় পরীক্ষা?" রফিকের কণ্ঠ। দরফর করে উঠলাম।

"কি? আজ? কি বার?"

"সোমবার।"

"আজ না কাল পরীক্ষা?"

"ওহ, আমি ভাবছিলাম আজ। আচ্ছা, ঘুমান। আমি নাস্তা নিয়ে আসছি।"

নাস্তা নিয়ে এসে আবার ঘুম থেকে জাগালো! আজব, তাহলে আবার ঘুমাতে বললো কেনো? রাগে কিছু বলতে পারলাম না। এখন

আমি তার মেহমান, মেহমানের মতো থাকতে হবে। হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসলাম। খাবারের সময় জিজ্ঞেস করলাম, সবাই তো কলেজ ছুটিতে বাড়ি গেছে, তুই যাস নাই কেন?

"শনিবার কলেজ খুলেই ক্লাস টেস্ট নিবে। তাই যাওয়া হয়নি।"

"ওহ, পড়াশোনা কেমন চলছে?"

"মোটামুটি।"

পড়াশোনার খোঁজখবর নিলে ছাত্ররা প্রায়ই বিরক্ত হয়। রফিক নাস্তা খেয়ে আরো প্রশ্ন থেকে বাঁচার জন্য বাথরুমে চলে গেলো। আমিও করতাম, কেউ পড়াশোনা নিয়ে প্রশ্ন করলে ঘুরিয়ে অন্য প্রসঙ্গে নিয়ে যেতাম। এবার রফিকের অনাগ্রহ দেখে মনে মনে তওবা করলাম, আর কারো সামনে অভিভাবক সাজতে যাবো না।

সারাদিন বই খুলে বসে আছি। কি না কিছ জিজ্ঞেস করে। সাধারণ জ্ঞানের বইটি খুব ভালো করে পড়লাম।

***

ভাইভার জন্য আমি একা আসিনি। আশেপাশে আরো পঞ্চাশ-ষাট জন ছিলো। এর মধ্যে ত্রিশ জন চাকরির জন্য নির্বাচিত হবে। বুকের ভেতর ধুকধুক করছে চাকরিটা হবে তো? নাকি ভিরের মধ্যে হারিয়ে যাবো!

এক এক করে সবার নাম ডাকা হচ্ছে। রুমে গিয়ে সবাই দশ মিনিটের মতো থাকে, তারপর বেরিয়ে যায়। কারো মুখ মলিন, আবার কারো মুখে হাসি। আমার কাছে সে হাসি পৈশাচিক হাসির মতো মনে হয়।

এক পর্যায়ে আমাকে ডাকা হলো। খুব পরিপাটি হয়ে দরজার কাছে গিয়ে বললাম,

"স্যার, আসতে পারি?" রুমের ভেতর তিনজন বসা। তাদের মধ্যে একজন বললো, "নিশ্চয়ই।"

বুটের থকথক শব্দে টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। একজন চোখের ইশারায় বসতে বললো। বসলাম।
তৃতীয় জনের চোখে নয় নাকে চশমা। তিনি নাকের মাঝ বরাবর চশমা রেখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "সিভিটা দিন।"

দিলাম। খুব নেড়েচেড়ে দেখলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন,

"আমরা যদি আপনাকে চাকরিটা দেই, তাহলে আপনি প্রথমে কি করবেন?"

"আপনাদের অনেক কৃতজ্ঞতা জানাবো, কারণ চাকরিটা আমার খুব প্রয়োজন।"

"এখানে সবাই চাকরি প্রয়োজন। ধরুন, আপনি বাতিল হলে কি করবেন?"

"আবার চেষ্টা করব।"

"আচ্ছা, আপনার বাবা কি করেন?"

"ছোটখাটো ব্যবসা।"

"মা?"

"মা নেই, ছোটবেলায় হারিয়েছি।"

"মায়ের কথা খুব মনে পড়ে তাই না?"

"তেমন না, মায়ের শূন্যতা অন্য মা পূরণ করেছে।"

"ওহ, বলুন তো, রবীন্দ্রনাথ কবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং কোন কাব্যগ্রন্থের জন্য?"

"১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য।"

"বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ কে আবিষ্কার করেন?"

"মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।"

আরেকজন জিজ্ঞেস করলেন, "বাংলাদেশের প্রথম নারী এভারেস্ট জয়ী কে?"

"নিশাত মজুমদার।"

"আজ বাংলা মাসের কত তারিখ?"

"১৪ জৈষ্ঠ্য।"

"হয়নি, ১২ জৈষ্ঠ্য।"

"সরি স্যার।"
"তা, এখন আসুন।"
"ধন্যবাদ স্যার।"

কিছুটা স্বস্তি লাগছে। ভাইভার মোটামুটি ভালো হয়েছে। কিন্তু শেষের প্রশ্নটা আত্মবিশ্বাস এলোমেলো করে দিলো। ধ্যাত! বাঙালি হয়ে বাংলা মাসের তারিখ জানি না!

অধ্যায়-৮

চেয়েছিলাম ভাইভা শেষে বাড়ির দিকে রওনা হবো কিন্তু তা আর হলো না। নাছোরবান্দা রফিক যেতে দিলো না, আরো একদিন থাকতে হলো। একদিনে শহরের অনেক জায়গায় ঘুরে এলাম।

রফিক, আমি আর ঐ ছেলেটা, যার নাম জানা ছিলো না এখন জানা হলো মিরাজ। আমরা একসাথে রাতের খাবার খেলাম। তারপর কিছুক্ষণ গল্প করে যার যার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ঘোরাঘুরিতে শরীর ক্লান্ত, তাই শুয়ে পড়ার সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ ফোনের রিংটোন কানে ভেসে এলো। বড় যন্ত্রণায় সবে মাত্র ঘুমিয়েছি। বালিশের পাশে থেকে ফোন হাতে নিয়ে নম্বারটা দেখার চেষ্টা করলাম। চোখের ক্লান্তি বারবার বাধা দিলেও কয়েক পলক ফেলে নম্বারটা দেখলাম। বন্ধু সবুজ ফোন করেছে। সময় দেখাল ০৩:৪৩। অর্থাৎ ঘুমের বয়স মাত্র তিন থেকে চার ঘণ্টা। মোবাইল কানের কাছে নিয়ে রাগিভাবে বললাম,

"এতো রাতে কেউ কাউকে কল করে?"

ওপাশ থেকে কান্নাজড়িত কণ্ঠে শুনলাম,

"দোস্ত, চাচা খুব অসুস্থ। তুই তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আয়।"

বুকের ভেতর ব্যাঙটা লাফাতে শুরু করলো। আচমকা এই কথা শোনার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। জিজ্ঞেস করলাম,

"কি হয়েছে আব্বার?"

"এতো কথা বলতে পারব না, তুই তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আয়।"

"এক কাজ কর, আমি এখানে হাসপাতাল ঠিক করে রাখি। তুই আব্বাকে নিয়ে ঢাকায় চলে আয়, ভালো চিকিৎসা হবে।"

"তোকে বাড়ি আসতে বলছি।" এ বলেই লাইনটা কেটে দিলো।

ওর ফোন কেটে যাওয়ার পর চুপচাপ বসে রইলাম। এই মুহূর্তে কী করা উচিত বুঝতে পারছি না। পাঁচ মিনিট পর আব্বার নাম্বার থেকে ফোন এলো। তাড়াতাড়ি রিসিভ করলাম। ওপাশ থেকে কেউ হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো,

"ভাইয়া, আব্বা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।"

"মানে?"

"আব্বা আর আমাদের মাঝে নেই।"

বুঝতে পারছি কায়েস বলছে কিন্তু মানতে পারছি না যে আব্বার নাম্বার থেকে তার মৃত্যুর খবর শুনতে হবে। এক সময় মনে হলো স্বপ্ন। কিন্তু না, স্বপ্ন হলে এত বিবর্ণ মুহূর্তে ঘুম ভেঙে ফিরে আসতাম বাস্তবে। এখন বাস্তবকে জোড় করেও স্বপ্ন বানানো যাবে না। নিজেকে কয়েকবার নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলাম, শেষমেশ হেরে গিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলাম আর মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে লাগলাম।

ঐ পাশ থেকে রফিক আর মিরাজ ছুটে এসে বাতির সুইচ অন করলো। সাথে রুমে আলো ভরে গেলো। কিন্তু আমার জীবনে কিছুক্ষণ আগে অন্ধকার নেমে এলো এই অন্ধকার কোনো বাল্ব দিয়ে আলোকিত করা যাবে না।

***

রাস্তায় দু-একটা নেড়ি কুকুর আর আমি ছাড়া কোনো জীব নেই। রফিক আমাকে এ অবস্থায় কোনোভাবে একা ছাড়তে চাইছিল না, ও নিজেও আসতে চাইছিল। আমি নিয়ে আসি নাই, পরশু ওর পরীক্ষা। আজ গিয়ে কালকে আসা, তারপর পরের দিন পরীক্ষা দেওয়া ওর জন্য কষ্টসাধ্য হতো। ল্যাম্পপোস্টগুলো তার মাথায় বাল্ব জ্বালিয়ে রাস্তার দিকে ঘাড় বাকা করে নুয়ে আছে। রাস্তা দিয়ে হাঁটছি আর পিছনে বারবার তাকাচ্ছি কোনো সিএনজি বা রিকশা পাই কিনা। এ সময় দু-একটা সিএনজি পাওয়া যায়। কেউ রাতে ডিউটি করে বাড়ি ফিরে।

হাসপাতালে রোগীর স্বজন যাওয়া-আসা করে। কেউবা নিষিদ্ধ পল্লি থেকে ফিরে আসে। বড়লোকের ছেলেপুলেরা রাতে বিভিন্ন ক্লাবে মজা-মাস্তি করে বাসায় ফিরে। ওরা নিজেদের গাড়ি নিয়ে বাসায় ফিরে।

আমি কোনো সিএনজি দেখছি না, কোনো প্রাইভেট কার পেলেও হতো। যে করেই হোক বাসস্টেশনে নামিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতাম। দূরে একটা কিছু দেখা যাচ্ছে, বুঝতে পারতাম রিকশা। কাছে এসে কয়েকটা বেলে বারি দিয়ে বললো, "কই যাইবেন মামা?"

"বাসস্টেশন।"

"ওঠেন।"

আমি দেরি না করে উঠে বসলাম। পিচঢালা রাস্তায় গড়গড় শব্দ করে চালকের পায়ের জাদুতে রিকশা এগিয়ে যাচ্ছে। চারদিক থেকে মৃদু বাতাস এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

ফুটপাতের এখানে-সেখানে মানুষ ঘুমিয়ে আছে। রিকশার বেলের টুংটাং শব্দ, গাড়ির হর্ন তাদের ঘুম নষ্ট করে না, বরং এটা তাদের ঘুম পাড়ানোর জন্য বিশেষ সুরেলা ধ্বনি।

"মামা আইসা পড়ছি, নামেন।"

স্পষ্ট কাতর স্বরে বললাম, "ওহ, ভাড়া কত?"

"আশি টাকা।"

"তিরিশ টাকা তো!"

"মামা, রাইতের বেলা নিয়া আইছি।"

টাকা নিয়ে কিপটামি করে সময় নষ্ট করা এই মুহূর্তে বেমানান। তবুও পকেটের পরিস্থিতি বিবেচনা করে যা পারা যায়, টাকা বাঁচিয়ে বাড়ি পর্যন্ত যেতে হবে। বললাম, "আচ্ছা, বিশ টাকা কম রাখেন।" এই বলে একশো টাকার নোট দিলাম। তিনি কোনো রকম প্রতিবাদ না করে চল্লিশ টাকা ফিরিয়ে দিলেন। তবে তার চোখ-মুখের ভাষায় বোঝা যায় এতেই তিনি জয়ী। তারপর রিকশা ঘুরিয়ে চলে গেল অন্য কোনো

গল্প বহন করতে। আমার গল্পে কেবল বিরহের আগমন। ষাট টাকার বিনিময়ে পথটা আরও সহজ।

অধ্যায়-৯

সংসারের পুরো দায়িত্ব আমার কাঁধে। বাজার, কায়েসের স্কুলের বেতন, তার ওপর গণিত প্রাইভেট স্যারের বেতন। কায়েস অংকে কাঁচা, পরীক্ষার আর বেশি দিন বাকি নেই, তাই অংকটা ভালোভাবে জানা ওর জন্য এখন জরুরি।

আব্বা মারা যাওয়ার পর টেনেটুনে সংসার চলছিল। তার দোকানে যে মালামাল ছিল তা বিক্রি করে ধার দেনা পরিষদ করে কিছু টাকা আমাদের ছিল। এই টাকা দিয়ে কোনোরকমে দুই মাস সংসারের খরচ চালিয়ে নিয়েছি। তারপর বেসরকারি প্রাইমারি স্কুলে একটা চাকরি জোগাড় করেছি। মাসে সাত হাজার টাকা বেতন পাই।
ঢাকা থেকে চাকরির জন্য আর কোনো ফোন আসে নাই। তারপরও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। একটা চাকরি হয়ে গেলে এর চেয়ে ভালো বেতন পেতাম। ফলে সংসারটা পুরোদমে চালিয়ে নেওয়া যেত।

পরিবারের সবার হাবভাব পরিবর্তন হয়েছে। শিলা একা মুখ বুজে বসে থাকে, মাঝে মাঝে বান্ধবীর বাড়ি থেকে ঘুরে আসে। আম্মার সকালে ফজরের নামাজ পড়ে এক দফা কান্না না করলে দিন শুরু হয় না। কায়েসের আগের মতো স্কুলে যাওয়া আসা, বাসায় পড়াশোনা আর মাঝে মাঝে বন্ধুদের সাথে খেলতে যাওয়া। ওর ভাবটা এমন, সবকিছুই আগের মতো ঠিকঠাক। আমার এখন সবুজের সাথে তেমন আড্ডা হয় না। ও মাঝে মাঝে এসে খোঁজখবর নিয়ে যায়।

সকালে পাখির কিচিরমিচির শব্দে ঘুম ভাঙে। তাড়াহুড়ো করে স্কুলে যাই, তারপর বাচ্চাদের চেঁচামেচি। পাখিদের কিচিরমিচির শব্দ কানে মধুর লাগে, আর বাচ্চাদের চেঁচামিচি তার থেকে পুরো উল্টো। টেবিলের উপর বেতের কয়েকটা ঠাসঠাস বারি দিলে ঠিক হয়ে যায়।

দু-এক মিনিট পর আবার কারো পুন পুন শব্দ, তারপর দু-একজনের নালিশ। এই নালিশের ফাঁকে যে যার মনের কথা সেরে নেয়। ক্লাস শেষ করে বেরুবার সময় মনে হয় আমি ভেতরে একটা মেশিন চালু করে দিয়ে এসেছি।

***

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। বিকেলে ঘুম থেকে ওঠার পর মনটা অকারণেই খারাপ। সামনের বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে বাইরের দিকে চেয়ে আছি। চারদিক কেমন নিস্তব্ধ হয়ে আছে। টের পেলাম সামনের পুকুর ঘাটে কে যেন কলকল শব্দ করে পা ধুচ্ছে। কয়েক দিন ধরে টানা বৃষ্টিতে রাস্তায় কাদা হয়েছে। বাড়িতে আসার সময় ওই কাদা পুকুর ঘাটে যেতে বাধ্য করবে।

দীর্ঘদিন একসাথে থাকলে পায়ের শব্দ পেলেও বোঝা যায় কে আসছে। এই পা ধোয়ার আওয়াজ শিলা, কায়েস, আম্মার কারো না। একদম অপরিচিত। আমি অপেক্ষায় রইলাম, কে হতে পারে!
কেউ একজন বাড়ির দিকে ঢুকছে। সাদা পাঞ্জাবি ও পায়জামা। পায়জামাটা নলা পর্যন্ত ভাজ করা। মুখে মেহেন্দি দেওয়া লাল লম্বা দাঁড়ি। বয়স ষাটের কাছাকাছি হবে। এর আগে আমি তাকে কখনো দেখি নাই। সামনে এসে নরম গলায় সালাম দিলো,

"আসসালামু আলাইকুম।"

"ওয়ালাইকুমুস সালাম।"

"মন খারাপ নাকি মশাইর?"

"না, ঘুম থেকে উঠলাম।"

"ওহ, আমাকে চিনতে পারছেন?"

"না, ঠিক চিনলাম না।"

হাসতে হাসতে বললো, "চিনবেন চিনবেন। আচ্ছা, মাগরিবের ওয়াক্ত ঘনিয়ে আসছে, এখানে আশেপাশে মসজিদ আছে?"

"মসজিদ একটু দূরে, কাদা পার হয়ে যেতে সময় লাগবে। আমি

জায়নামাজ দিচ্ছি, আপনি ওযু করে আসুন।"

"ওযু করা আছে।"

এমন সময় আম্মা ভেতর থেকে বললো,

"কে ওখানে?"

আমি বললাম, "একজন মুরুব্বি, আপনি চিনবেন না।"

লোকটি আমাকে অবাক করে দিয়ে আম্মার উদ্দেশে বললো, "আমি গনি মিয়া।"

আম্মা ভেতর থেকে বললো, "গনি মিয়া? চিনলাম না তো।"

"না দেখলে চিনবেন কেমনে?"

এমন সময় মাগরিবের আযান পড়ে গেল। আমি বললাম,

"আচ্ছা, আপনি এখন নামাজ পড়ুন, তারপর কথা হবে।"

লোকটি নামাজে দাঁড়িয়ে গেল। আমি ভেতরে গিয়ে হাবভাব বোঝার চেষ্টা করলাম। আম্মা ফিসফিস করে বললো,

"ঐ বেটা কে?"

"চিনি না। মনে হয় শিলার জন্য বিয়ের কোনো প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। আচ্ছা, শিলা কোথায়?"

"শিলা তো ওর বান্ধবীর বাড়িতে গেল, এখনো ফিরলো না। একটু ফোন করে দেখ।"

"ফোন করলেও তো সন্ধ্যাবেলা একা আসতে পারবে না। আচ্ছা, কায়েস কোথায়? ওরে পাঠিয়ে দেন। ততক্ষণ আমি ওনাকে ব্যস্ত রাখি।"

লোকটি নামাজ শেষ করে বসে আছে। ওনাকে আপ্যায়ন করতে হবে। আম্মা মাগরিবের নামাজ শেষ করে চা তৈরিতে লেগে গেছে। উনি নরম গলায় বলতে শুরু করলো,

"আচ্ছা, আপনাদের পুরো রাস্তা তো দেখছি কাঁচা। চেয়ারম্যান কেমন কাজ করে বুঝলাম না।"

আমি বললাম, "সবসময় তো আশ্বাস দেয়, কাজ তো করে না। কি আর করার!"

"কোনো কাজ নাই, তারপরও মানুষ ওনাকে কেন ভোট দেয় বুঝি না। কই, আপনার আম্মা কই? ওনাকে এখানে আসতে বলুন দেখি, সে আমারে কেমনে চিনে না!"

আম্মাকে ডাক দেওয়ার কিছুক্ষণ পর চা নিয়ে হাজির। আম্মা তাকে দেখে হকচকিয়ে বললো,

"ও গনি ভাই আপনি? এতোদিন পর আমাদের কথা কেমনে মনে পড়লো?"

"বাড়িতে আইছি অনেকদিন পর, তারপর ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু দেখা করে যাই।"

"ও, তাহলে চারটা ডালভাত করি, রাতে আমাদের সাথে খাবেন?"

"না না, আজ না, অন্যদিন।"

লোকটি আর কথা না বাড়িয়ে মূল কথায় চলে গেলো। "আসলে আপনি তো জানেন, আমি অনেক বছর আগে থেকেই ঢাকা ব্যবসা করি।" ফাঁকে আমার দিকে ফিরে বললো,

"ওরা আমাকে চিনবে কেমনে? যখন গ্রাম ছাড়লাম তখন তো এদের ছোট দেখে গেছি। তারপর তো আর গ্রামে বেশি আসা হয় নাই। যখন আসতাম তখন তো সুলতান ভাইয়ের সাথে দেখা করতামই। তো কিভাবে যে বলি, সুলতান ভাই আমার থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার নিছিলো। এই বছর দেওয়ার কথা ছিলো। তারপর তো সে আমাদের ছেড়ে চলে গেলো। আল্লাহর খেলা বোঝা বড়ই কঠিন। আমি একবার সিদ্ধান্ত নিছিলাম টাকাটা আপনাদের কাছে চাইবো না। তারপর দেখি, নিজেরই চলতে অনেক সমস্যা হয়। কোনোরকমে দিন কাটাই। আপনাদের আমি জোর করছি না, আপনারা যেদিন পারেন টাকাটা দিয়েন। আমার খুব দরকার।"

তার মুখে কথাটা শুনে অনেক বড় ধাক্কা খেলাম। দোকানের মালামাল বিক্রি করে ছোটখাটো দেনা পরিশোধ করতেই হিমশিম খেয়েছি। এখন পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি কই থেকে জোগাড় করবো!

নিজেকে কোনো রকম সামলে বললাম,

"আচ্ছা, আব্বার কাছে যারা টাকা পাইতো, ডায়েরিতে তাদের নাম লেখা ছিলো। আপনার নাম তো দেখলাম না?"

"আরেকবার দেখুন, দয়া করে।"

আম্মা ঘরের ভিতর থেকে ডায়েরিটা নিয়ে আসলো। একটা একটা করে পাতা উল্টাতে লাগলাম। অবশেষে আবিষ্কার করলাম লোকটির কথা সত্যি। আব্বা বড় সরল মনের মানুষ ছিল। ডায়েরির এক জায়গায় সরল ভাবেই লেখা আছেঃ "গনি মিয়া পাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা।"

মাসে সাত হাজার টাকার সংসার ডালভাত খেয়ে মোটামুটি চলছিল। এখন পঞ্চাশ হাজার টাকার চিন্তাটা মাথায় গভীরভাবে ক্ষত সৃষ্টি করেছে।

অধ্যায়-১০

স্কুলের প্রধান শিক্ষককে বলা যায়। তিনি বড্ড ভালো মানুষ। ছোটবেলায় আব্বার সাথে পড়াশোনা করেছে। আব্বা মারা যাওয়ার পর তিনি আমাদের পাশে না দাঁড়ালে আজ এই চাকরিটা আমার দেখতে হতো না।

অবশেষে তার কাছে সবকিছু খুলে বলার পর তিনি আশ্বস্ত করলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা দিবে। কিন্তু মাসে কম করে হলেও তিন হাজার টাকা করে তাকে দিতে হবে। তার কথায় কিছু না ভেবেই রাজি হয়ে গেলাম। ভাবারও কথা না, এইরকম প্রস্তাব আর কারো কাছে পাবো না। বেতনের সাত হাজার থেকে তিন হাজার বাদ দিলে চার হাজার। এটা দিয়ে আপাতত বাজার খরচ চালিয়ে নেওয়া যাবে।

টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরলাম ও সিদ্ধান্ত নিলাম পরেরদিন গনি মিয়াকে বুঝিয়ে দিবো।

রাতে ভাত খাওয়ার জন্য ডাক এলো। আমি আর কায়েস খেতে বসলাম। আম্মা শিলাকে ডেকে চলছে। শিলা একবার বলছে খাবে না, তারপর আবার ডাক দেওয়ায় চেঁচিয়ে উঠলো। ওর মেজাজ আজকাল এতো গরম, কেউ কোনো কথা ছোঁয়াতে পারে না, তাহলে বাঘের মতো গর্জন করে উঠে। একদিন টেবিলে বসে বই পড়তেছিলো। কায়েস গিয়ে মজা করে বলে, "কিরে আপু, কার চিঠি?" সাথে সাথে বইটা ওর দিকে ছুড়ে মারে। আব্বা মারা যাওয়ার পর সবচেয়ে বেশি আঘাত বোধহয় শিলা পেয়েছে। এর আগে সবার সাথে স্বাভাবিক আচরণ করতো।

শিলার আচরণ তোয়াক্কা না করে আম্মা আমাকে বললো, "ওর জন্য একটা পাত্র দেখ। আর তুই বিয়ে করবি কবে?"

"আগে শিলাকে কোনো ভালো ছেলের সাথে বিয়ে দেই, তারপর আমার চিন্তা করা যাবে।"

কায়েস তামাশা করে বললো, "শিলা আপু আজকাল কেমন যেন করতেছে, তারে বিয়ে করবে কেডা?"

কায়েসের কথা শিলার রুমে পৌঁছে যাবে এটা কায়েস আন্দাজ করতে পারে নাই। সাথে সাথে ঐ রুম থেকে শিলা ঝড়ের মতো এসে কায়েসের দিকে চেয়ে বললো, "ঐ কি কইলি? জুতা চিনো জুতা। মেরে গালের চামড়া লাল করে দিবো, যত্তসব!"

আমি আর আম্মা অবাক দৃষ্টিতে শিলার দিকে তাকিয়ে আছি। নিয়ম করে মানুষের জীবনে হতাশা আসে। আবার খুব কম সময়ে মানুষ এই হতাশা কাটিয়ে উঠে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু শিলা হতাশাকে এতোদিনেও গ্রাস করতে পারে নাই! ওর এতোটা পরিবর্তন আমাদের সবাইকে অবাক করেছে। কায়েস এবার কোনো মতে মেনে নিতে পারছে না শিলা ওর সাথে এইরকম আচরণ করতে পারে। থালায় পানি ঢেলে উঠে গেলো। বেচারার চোখেও পানি এসে টলটল করছে।

***

মাঝরাতে ঘুম আসছে না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছি, তারপরও কিছুতেই ঘুমের জগতে তলিয়ে যেতে পারছি না। মাথায় একটার পর আরেকটা চিন্তা নাড়া দিচ্ছে। হেড স্যারের টাকা পরিশোধ করতে হবে, কায়েসের পড়ালেখার খরচ, শিলার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। আম্মা প্রায় দিন বলে শিলার জন্য পাত্র দেখেতে। আম্মাকে কে বোঝাবে, পাত্র দেখলেই তো হলো না। বিয়ে দিতে তো অনেক টাকার দরকার, এই টাকাটা এই মুহূর্তে কোথায় পাবো!

আব্বা বেঁচে থাকতে বলতো, আমার একমাত্র মেয়ে আমার পছন্দের ছেলের সাথেই বিয়ে দিবো। এতে আশপাশের কারো মত থাকুক বা না থাকুক। আব্বার সেই ইচ্ছেটা পূরণ হলো না। হঠাৎ এভাবে ব্রেন স্ট্রোকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিবে, কেউ কল্পনাও করতে পারে নাই। তার ধার-দেনা নিয়ে আমার কোনো আফসোস নেই। জানি টাকাগুলো আমার পড়ালেখার পিছনেই ব্যয় করেছে। ঢাকায় বসে যখন টাকা চেয়েছি তখন পাঠিয়ে দিয়েছে। তাই টাকার মর্মতা বুঝতে পারিনি, তেমনি ডানে-বামে না তাকিয়ে খরচ করেছি। এখন টাকা কি জিনিস, হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছি।

হঠাৎ ঘরের পিছনের ঘাটের কাছে কিছুর সাড়া পাচ্ছি। তাড়াহুড়ো করে শোয়া থেকে উঠে পিছনের দরজা খুললাম। আঁধারে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, তবে ওখানে একজন মানুষ আছে, তার অবয়বটা বুঝতে পারছি। হাঁটু ভাজ করে ঘার নিচের দিকে করে বমি করছে। এক-দু'পা করে তার দিকে এগোতে লাগলাম। বুকের ভেতর ধুরুধুরু করছে। স্টেশনে চা ওয়ালার কাছ থেকে ভূতের গল্প শুনেছিলাম, হঠাৎ সেই কথা মনে পড়ে গেলো। আমি ভূতপ্রেত তেমন বিশ্বাস করি না, তবুও এখন ভূতের ভয়টা তীব্রভাবে চেপে ধরেছে। শরীরের লোমগুলো এক-এক করে খাড়া হতে লাগলো। চিনচিন করে ঘাম বেরুচ্ছে। বুকের ধুকধুকানি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেলো। সিদ্ধান্ত নিলাম পিছনে ফিরে যাবো। মুহূর্তে মত পালটালাম, শিলার মতো দেখা যায়। নিশ্চিত হতে কাছে গেলাম, আরো কাছে। হ্যা, শিলা। তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে কপালে ডান হাত দিয়ে, বাম হাত মাথার পিছনে দিয়ে শক্ত করে ধরে রাখালাম। এতে বমি করার সময় রোগীর কিছুটা আরাম হয়। শিলা শিউরে উঠে বললো, "কে কে?"

"আমি।"

"কে ভাইয়া?"

"হুম।"

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, "এতো রাতে ঘুমাস নাই?"

"ঘুম আসে না, তোর কি শরীর খারাপ? গায়ে তো জ্বর নেই, কি

হইছে?"

"কে জানে, হঠাৎ করে বমি চলে আসলো। আর মাথাটা কেমন ব্যাথা করছে।"

"ও আয়, ঘাটে কুলি করে ঘরে গিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা কর। কাল ডাক্তারের কাছে বলে ঔষধ নিয়ে আসবো।"

শিলার হাত ধরে ঘাটের কাছে নিয়ে গেলাম। ও প্রায় অচেতন মনে হয়, এখনই পুকুরে পড়ে যাবে। নিজেকে একটু প্রস্তুত করে হাত-মুখ ধুয়ে নিলো। তারপর আমার সাহায্য নিয়ে উপরে উঠে বললো,

"ডাক্তারের কাছে যেতে হবে না, এমনিতেই ভালো হয়ে যাবো।"

আমি ওর কথার তোয়াক্কা না করে বললাম,

"ঘরে চল, শুয়ে থাকলে ভালো লাগবে।"

এক-এক পা করে ওর রুমে নিয়ে গেলাম। শিলা বিছানাটা কাছে দেখতে পেয়ে ধপাস করে শুয়ে পড়লো। সিনেমায় মাতালরা যেমন শুয়ে পড়ে, কিন্তু তারা শুয়ে পরার সাথে সাথে ঘুমিয়ে যায়। শিলার বেলায় এমনটা হলো না। হলে নিশ্চিত হওয়া যেতো বেচারির আজ রাতটা ঘুমে কাটবে, কাল চিকিৎসা পাবে। ও শুয়ে শুয়ে বললো,

"ভাইয়া মাথাটা ব্যাথা করছে, একটু হাত বুলিয়ে দে।"

"আচ্ছা, দিচ্ছি, ঘুমানোর চেষ্টা কর।"

হাত বুলাতে বুলাতে এক পর্যায়ে ও গভীর ঘুমে চলে গেলো। আমার চোখেও ঘুমে বাসা বাঁধল। ওর রুমের বাতি বন্ধ করে আমার রুমে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে স্কুলের দিকে রওনা হলাম। কাদায় হেটে যেতে বড়ো কষ্ট। রাস্তায় পা ফেললে গোরালি সমান পা কাদায় গিলে নেয়। তারপরও চপচপ করে এগিয়ে যেতে হয়।

আজ স্কুলে আগের তুলনায় অনেক বাচ্চা উপস্থিত। আমার প্রথম ক্লাস তৃতীয় শ্রেণিতে। ঘন্টার টুংটাং শব্দের সাথে সাথে ঢুকে পরলাম।

কাল রাতে ভালো ঘুম হয় নাই।তারওপর এটা-ওটা নিয়ে চিন্তা। মেজাজ অনেক ভারি, কিন্তু বাচ্চাদের সামনে ভারি মেজাজ দেখানো যাবে না। ওরা সব সহ্য করতে পারে, কিন্তু শিক্ষকের কালো মুখ সহ্য করতে পারে না। তাহলে ক্লাসের সবচেয়ে মেধাবী বাচ্চাটা হুট করে বলে উঠবে, "স্যার, আজকে মন খারাপ কেনো?" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ার জন্য আমাকে ফুরফুরে মেজাজে থাকতে হবে।

রোল নাম্বার এক থেকে ডাকা শুরু করলাম। পঁয়ষট্টি জন বাচ্চাদের মধ্যে মাত্র তিনজন অনুপস্থিত। বাহ!
হাজিরা খাতা বন্ধ করে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালাম। এমন সময় স্কুলের কেরানি এসে বললো, "স্যার, আপনাকে হেডস্যার তার রুমে ডাকছে।"

"এখনি?"

"হ, এখনি।"

স্যারের রুমে গিয়ে বললাম, "স্যার ডাকছিলেন?"

তিনি কাগজপত্র নাড়তেছেন। সেখান থেকে চোখ না সরিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, তোমার আম্মা তোমাকে ফোন করছে। ফোন রিসিভ করো না কেন? জরুরি কি কথা আছে নাকি তাই আমাকে কল করেছে।"

"আসলে ক্লাসে ঢুকার সময় ফোন সাইলেন্ট করে ঢুকছিলাম।"
এবার সে আমার দিকে তাকালো, মনে হলো পৃথিবীর কোনো আশ্চর্যজনক কথা বলে ফেলেছি।

"ও আচ্ছা, তাহলে এখন ফোন করে দেখো কি বলে।"

ফোন করলাম। কয়েকবার রিং হওয়ার পর ওপাশ থেকে মা বললো, "তাড়াতাড়ি বাড়ি আয়, শিলা অনেক অসুস্থ। ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।"
হঠাৎ মনে পরলো আজ সকালে আমার ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা ছিল। স্কুলে আসার তাড়াহুড়ো করে মন থেকে তা মুছে গেলো। ফোন

কেটে দিয়ে স্যারকে বললাম,

"স্যার, আমার বোন অসুস্থ, আমাকে বাড়ি যেতে হবে। আজ আমার ছুটির দরকার।"

"আচ্ছা, যাও। আজ তোমার ক্লাস আমি সামলাবো।"

আমি লম্বা লম্বা পা ফেলে বাড়ির দিকে হাটা শুরু করলাম। কাদামাখা লম্বা রাস্তা পিছনে ফেলে বাড়ি এসে দেখলাম শিলা খাটের ওপর শুয়ে আছে। মা আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে বোরকা পরে বসে আছে। আমাকে দেখে বললো, "সকাল থেকে বমি করছে, তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।"

শিলা কাতরাতে কাতরাতে বললো, "এই কাদার মধ্যে কিভাবে যাবো? তারচেয়ে ডাক্তারের কাছে বলে ঔষধ আনলেই পারো।"

আমি বললাম, "আচ্ছা, এরচেয়ে ভালো হয় আমি বাজারে গিয়ে একজন ডাক্তার নিয়ে আসি।"

বাড়ি থেকে বাজার অনেক দূরে। কাদার রাস্তা পেরিয়ে পাকা রাস্তার মাথায় গিয়ে গাড়ির তল্লাশি করতে হয়। সবসময় ওখানে গাড়ি পাওয়া যায় না। আজ পেলাম। টগবগে যুবক রিকশা নিয়ে বসে আছে আর মনের সুখে গান গাইছে। এই যুবককে কোথায় যেনো দেখেছি। তা এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। কিছু মানুষ দেখলেই মনে হয় তার সাথে যেনো আমার কতদিনের পরিচয়। যুবকটিও হয়তো সেই কাতারের। কিছু না জিজ্ঞেস করেই রিকশায় চেপে বসে পড়লাম। যুবকটি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কই যাবেন?"

"বাজারে যাবো, তাড়াতাড়ি চলুন।"

সে আর কেনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করে প্যাডেল ঘোরাতে লাগলো। যুবকটি গান গেয়েই চলছে।

প্রায় বাজারের কাছে চলে এসেছি তখন যুবকটি আমায় জিজ্ঞেস করলো, "আমাকে চিনতে পারছেন?"

"না, আপনার বাড়ি কোথায়?"

"মিঠাচর। আমি তো আপনাকে চিনতে পারছি।"

"আপনাকেও আমার চেনা চেনা লাগছে, তবে কোথায় দেখেছি মনে করতে পারছি না।"

"একদিন আপনারা ডাকাতের কবলে পরেছিলেন। আমি ঐ ডাকাত দলের একজন।"

যুবকটি জটিল কথাটা স্বাভাবিকভাবে বলে ফেললো, যেন ডাকাত দলে থাকাটা মহৎ কিছু। তবে আমি অস্বাভাবিকভাবে হা করে আছি। ডাকাতি পেশা ছেড়ে কিভাবে রিকশা চালক! আমার মনের কথা বুঝি যুবকটি বুঝতে পারলো। বললো, "আসলে মানুষেরটা খেয়ে আর কতকাল থাকবো? নিজে খাইটা খেলে মনে আনন্দ পাওয়া যায়। তাই সৎভাবে উপার্জন করতে ডাকাতি ছেড়ে রিকশা চালাচ্ছি।"

"ওহ, তাহলে বুঝতে পারলেন?"

"হুম, সব মানুষের তো একদিন মরে যেতে হবে। শেষ বিচারের দিন আল্লাহর কাছে কি বলবো! এসব ভাবতে ভাবতেই ডাকাতি ছেড়ে দিলাম।"

যুবকটির সাথে কথা বলতে বলতে বাজারে পৌঁছে যাই। রিকশা থেকে নেমে ভাড়া পরিশোধ করে বললাম, "আচ্ছা, মিঠাচর তো অনেক দূর। ওখান থেকে জীবিকার তাগিদে এতদূর আসছেন কেন? তারচেয়ে ঢাকাতেও যেতে পারতেন।"

"প্রতিশোধ।"

"মানে?"

আমার এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ততক্ষণে রিকশা ঘুরিয়ে প্যাডেল মেরে গান গাইতে গাইতে চলে গেলো। আমি তার দিকে একটু অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলাম। দূর পাগল নাকি! পাগলে কতকিছুই না বলে। যুবকটির কথা মাথা থেকে ঝেড়ে আমার মূল উদ্দেশ্য ডাক্তার খুঁজতে লেগে গেলাম।

বাজারে হাফিজুর হক ডাক্তারের খোঁজ পেলাম। কাদার ভিতরে আসতে প্রথমে নারাজ ছিলো। অনেক অনুরোধের পর আসতে সম্মতি জানালো।

***

শিলার লক্ষ্মণগুলো জেনে প্রেসার মাপলো, তারপর জিব দেখে আম্মার দিকে ফিরে বললো, "আপনি রোগীর কি হন?"

"মা।"

আমার দিকে ফিরে বললো, "আপনি কি হন?"

"ভাই?"

সে শিলার রুম থেকে বারান্দার দিকে আসলো, তারপর বাইরে নামলো। তার পিছু পিছু আমি।

"ডাক্তার সাব, কি হইছে?"

"আপনার বোনের কি বিয়ে হয়েছে?"

"না, কোনো?"

সে একটু নিশ্বাস নিয়ে বললো, "আপনার বোন অন্তঃসত্ত্বা।"

তার মুখে এরকম কথা শুনে আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাওয়ার মতো অবস্থা। নিজেকে কোনো রকম গুছিয়ে নিয়ে বললাম,

"মানে আপনি কি বলছেন? বুঝতে পারছেন? বুঝে শুনে বলছেন? আমার বোন একেবারে আলাদা, ও এইরকম করতে পারে না।"
ডাক্তার সাহেব আমার কথার কোনো জবাব দিলেন না। তিনি তার গন্তব্যের উদ্দেশে হেটে চললেন।

অধ্যায়-১১

খবরটি বাতাসের মতো ছড়িয়ে পড়ল পুরো গ্রাম। কেউ বলছে মেয়েটা উপরে এত ভালো অথচ তার ভিতরে কত গাদ। দোকানে দোকানে এটা নিয়ে আলোচনা হয়। আমাকে দেখলে হঠাৎ চুপচাপ হয়ে যায় স্কুলের দুষ্ট ছেলেটার মতো। যেনো সে এই পৃথিবীর সবথেকে সাধু। এটা নিয়ে গ্রামের ঝি বউদের উল্লাস সবচেয়ে বেশি।

আম্মা বাড়ির বাইরে কোথাও যেতে পারে না তাহলে গ্রামের লোকদের অনেক টিটকারি শুনতে হয়। কায়েসের স্কুলে যাওয়া কয়েকদিন ধরে বন্ধ। ওর বন্ধুরা ওকে নিয়ে হাসিতামাশা করে। স্কুলে চাকরির সুবাধে আমার বাড়ির বাইরে বের হতে হয়। কেউ আমার সামনে এসে দুটো কথা বলার সাহস পায় না। তারপরও আমাকে দেখলে কেউ কেউ কানাকানি করে। কি নিয়ে কানাকানি করে বুঝতে পারি তবে প্রতিবাদ করতে পারি না। প্রতিবাদ করার মতো আমার কোনো মানসিক শক্তি নেই। প্রতিবাদ করতে গেলে এরা বলবে, চোরের মায়ের বড়ো গলা।

শিলাকে কয়েকবার জিজ্ঞেস করছি, "এমনটা করলি কেনো? তোর পছন্দের কেউ থাকলে আমাদের বলে দেখতি। আমরা তার সাথে বিয়ে দিয়ে দিতাম। আমাদের মুখে চুনকালি মাখতে গেলি কেনো?"
আমার কথা ওর কানে গিয়ে অতল গহ্বরে হারিয়ে যায়। শুধু নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকে ও চোখের পানি ফেলে। শিলা কিছু না বলায় আমি মেজাজ হারিয়ে জীবনে প্রথম বার ওকে থাপ্পড় দিয়েছিলাম। তারপরও কোনো কথা বের করা গেলো না।
এইরকম ভাবে তো আর চলা যাবে না। গ্রামের মানুষ যা জানার জেনেই গেছে। এখন একটা চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আম্মার কাছে মত জানতে চাইলাম।

তিনি বললেন, "ওর পেটে এই জারজ বাচ্চা বাসা বাধার আগে নষ্ট করতে হবে। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে নিতে হবে।" আমিও কিছু না ভেবে এই অমানবিক সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। পৃথিবীতে কোনো প্রানের আগমনের আগেই তাকে খুন করতে হবে এর চাইতে অমানবিক কিছু হতে পারে না।

কাল যখন গোটা হাশেমপুর ঘুমাবে তখন আমরা শহরের দিকে রওনা হবো। ফারুকের সাথে কথা পাকাপাকি করে রাখলাম। ও ভ্যান নিয়ে পাকা রাস্তার মাথায় অপেক্ষা করবে।

***

ঘর থেকে রাত একটার দিকে বের হলাম। এখন হাতে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা। হেড স্যারের কাছ থেকে গনি মিয়াকে দেওয়ার জন্য যে টাকাটা এনেছিলাম সেটা আর তাকে দেওয়া হয় নাই। এখন বর্তমান সময়ের বিপদ মিটাই পরে গনি মিয়ার টাকা যেভাবে হোক দেওয়া যাবে।

কাদার ভেতর চারজনে ক্যাচত ক্যাচত করে হেঁটে চলছি। শিলার হাটতে অনেক কষ্ট হচ্ছে তারপরও ও হাটতে বাধ্য। এই পরিস্থিতি না হলে শিলা ন্যাকামো করতো। এখন ন্যাকামো ওর শোভা পায় না। আম্মা ওর ডানা ধরে রেখেছে। একটা জিনিস আমায় বড়োই অবাক করছে শিলার এই পাপিষ্ঠ কর্মকান্ডে আম্মা ওরে একটুও বকাঝকা করলো না, একটুও না। শুধু উপরের দিকে ফিরে একবার বলেছিল, হে আল্লাহ কোন পাপের শাস্তি ভোগ করছি!

প্রায় পয়তাল্লিশ মিনিট হাটার পর পাকার মাথায় এসে পৌছালাম। ফারুক ভ্যান নিয়ে ওখানেই বসে আছে যেই কথা সেই কাজ। আমাদের দেখে ফারুকের মেজাজ গরম হওয়ার কথা কারন আমাদের আসার কথা সাড়ে বারোটায় এখন প্রায় দুইটা। জোয়ারের পানিতে

চারধার ডুবে গেছে তাই গ্রামের ছেলেপেলেরা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নিয়ে মাছ ধরতে নেমেছে। ওরা বাড়ি ফেরার পর আমরা ঘর থেকে নেমেছি। এই লুকোচুরির কারনে এতক্ষণ দেরি হয়ে গেলো। ফারুক ঠান্ডা গলায় বললো, "রোগীর জন্য একটা তোষক নিয়ে আসতেন। বেশি অসুবিধা হলে শুয়ে থাকতো।"

আমি বললাম, "তোষকের দরকার নেই। বাস স্টেশন পর্যন্ত যেতে পারলেই হলো।"

বিলের পানিতে পা ধুয়ে ভ্যানে চেপে বসে পরলাম। আর ফারুক ভ্যানের সাথে আমাদের নিয়ে এগিয়ে চললো।

প্রায় দেড় ঘন্টা পর আমরা বাস স্টেশনে পৌছালাম। কিছুক্ষণ পর ফজরের আযান হবে। ফারুকের টাকা মিটিয়ে দিলাম ও আবার ভ্যান নিয়ে হাশেমপুরের দিকে ছুটে চললো।

যাত্রী ছাউনিতে এসে কায়েস শুয়ে পরেছে। আম্মাও একটু ক্লান্ত তারপরও তিনি অনেক কষ্টে চোখ খুলে রেখেছে। শিলা তার কাঁধের উপর মাথা দিয়ে রেখেছে। কয়েকদিন ধরে আমার শিলার প্রতি মায়া মমতা কিছুই কাজ করছে না। ওর ভবিষ্যতের কথা ভেবে এখন আমি শুধু বড়ো ভাইয়ের পৈশাচিক দায়িত্ব পালন করছি।

তাদের থেকে একটু আড়ালে গিয়ে পকেট থেকে সিগারেট বের করে জ্বালালাম। খুব দ্রুত টেনে যাচ্ছি অথচ এতো দ্রুত টানার কথা না বাস ছাড়তে এখনো আড়াই ঘন্টা বাকি। বুঝলাম বাজে চিন্তা আমাকে অস্থির বানিয়ে তুলছে।

আম্মার ডাক আসলো। সিগারেট শেষ করে তার কাছে গেলাম।

"কি হইছে?"

তিনি ঘুম মাখা চোখে বললো, "বাস কখন ছাড়বে রে?"

"ছয়টার দিকে।"

"আশেপাশে টিউবওয়েল আছে? খুব পিপাসা পেয়েছে।"

"আছে একটু দূরে কিন্তু পানি নিয়ে আসবো কিভাবে? পাত্র নাই তো।"

"আমি গিয়ে খেয়ে আসবো।"

কায়েসকে কয়েকটা ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তুলে বললো, "শিলার পাশে বস আমি একটু পানি খেয়ে আসি।"

কায়েস বিরক্তিকর ভাব নিয়ে উঠে বসে শিলার ডানা ধরে রাখলো। এমনভাবে ধরলো ও যাতে কোনো দিকে হেলিয়া না পরে। টিউবওয়েলের কাছে গিয়ে আম্মা গরগর করে পানি গিলতেছে যেন এক যুগ পর পানির দেখা পেলো। এখন এর পুরো স্বাদ নিয়ে নিবে।

পানি পান করার পর আম্মা আমাকে কিছু বলতে গিয়েও আবার নিজেকে আটকিয়ে নিলেন। যাত্রী ছাউনিতে ফিরে আম্মা ক্লান্তিভাবে বসে পরলেন।
আমি হেলান দিয়ে বসে পরলাম এর মধ্যে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ফজরের আযান ভেসে এলো।

আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর। আশহাদু আল্লাহ লা ইলাহা
ইল্লাল্লাহু, আশহাদু আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু।

আমি চোখ বুজে কান পেতে শুনতেছি, কি মিষ্টি, কি মায়া!

***

অনেক ঘোরাঘুরির পর হাসপাতালে একটা সিট পেলাম। তাও সাধারণ ভাড়ার চেয়ে দ্বিগুণ। ঢাকা আসতে আসতে আমাদের দুপুর হয়ে গেছে। এ সময় সবার মাথা একটু আকটু গরম থাকে। সিট ভাড়া নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে এক দফা ঝগড়া হয়ে গেছে।

ডাক্তার সাহেব লাঞ্চ করতে বাসায় গেছেন। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম ফিরবে চারটার সময়।
বাসে রুটি আর কলা খেয়েছি এখন আবার ক্ষিদে পেয়েছে। কায়েসকে নিয়ে হোটেলে খেতে গেলাম। ডিম আর ডাল দিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে আম্মা আর শিলার জন্য নিয়ে এলাম।

কোনো রকমে পেটের জ্বালা মিটাবার পর এখন শুধু ডাক্তারের জন্য অপেক্ষার পালা। শিলার সিটের পাশে আম্মা আর কায়েসকে বসিয়ে বাইরে গেলাম সিগারেট ফুঁকতে।

সিগারেটের দোকানের কাছে গিয়ে চোখ আটকে গেলো। চেয়ারম্যানের ভাই বাবলু দোকানে বসে চা খাচ্ছে আর সিগারেট ফুঁকছে। আজব তার এখানে কাজ কি!
আমাকে দেখলে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে তাই কেটে পড়াই ভালো। একটা চটপটির দোকানের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম আর ওখান থেকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। মিনিট দুয়েক পর দোকানের টাকা মিটিয়ে চলে গেলো। যাক আপদটা বিদায় নিলো।

ডাক্তার এখনো আসছে না চারটা বেজে বিশ মিনিট হয়ে গেলো। অবশেষে কাঙ্ক্ষিত ডাক্তার আসলো আর তিনি কোনো দিক না তাকিয়ে সোজা তার রুমে চলে গেলো। অপেক্ষমাণ মানুষদের মনে এক প্রকার উত্তেজনা বিরাজ করছে। সবাই একটু নড়েচড়ে বসেছে।
শিলার সিরিয়াল আসতে আসতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেলো। শিলার সাথে ডাক্তার সাহেবের রুমে আম্মাও গেলেন। প্রায় দশ মিনিট পর বেরিয়ে আসলো। আম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কি বলছে ডাক্তার সাহেব?"
"কয়েকটা ঔষধ লিখে দিলো আর ইনজেকশন দিলো। তাহলেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবে।"
আমি ভাবছিলাম এখানে কয়েকদিন থাকতে হবে। আগে জানলে তো সিট ভাড়া নিতাম না। সিরিয়াল কেটে রাখলেই হতো। এখন সিট

ভাড়ার টাকাটা পুরোপুরি গোল্লায় গেলো। এই জন্যই ডাক্তারি বিষয়েও জ্ঞান থাকা ভালো।

রাতে এখানে থাকবো না। ঔষধ আর ইনজেকশন কিনতে কিছু টাকা খরচ হলো। এখন আরো টাকা খরচ না করাই ভালো। মধ্যবিত্ত পরিবারের হিসাব করে দিন গুনতে হয়। তাই রাতেই বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

সারারাত বাস চলার পর বাস স্টেশনে ফিরতে ফিরতে প্রায় ভোর হয়ে গেছে। কয়েকটা রিকশা ছাড়া কিছুই পেলাম না। তাও হাশেমপুরের দিকে যেতে রাজি না। প্রায় আধ ঘন্টা অপেক্ষার পর একটা ভ্যান সামনে আসলো। সে ভ্যানে চেপেই হাশেমপুরের দিকে রওনা হলাম। আম্মা বললো, "এখন বাড়ির দিকে গেলে সবাই তো দেখবে। আবার কি না কি বলাবলি করে। এখন যাওয়াটা ঠিক হবে?"

"এখন না যেয়ে উপায় কি? কোথায় থাকবো! নাচতে যখন নেমেছি ঘোমটা দিয়ে কি লাভ?"

আমার এ কথায় আম্মা কিছু বললেন না। মুখটা কালো করে শুধু সামনের রাস্তার দিকে চেয়ে রইলো। শিলার কানে এ কথা পৌঁছেছে। এর উত্তর দেওয়ার মতো ভাষা ওর নেই। কায়েস ভ্যানের পিছনে বসে পথ মাপছে। পরিবারের উপর দিয়ে এতো ঝড়বন্যা হয়ে যাচ্ছে এতে ও স্বাভাবিকের মতো থাকে কেমনে এটা মাঝে মাঝে আমায় অবাক করে।

ভ্যানের প্যাডেলের শব্দ শুনতে শুনতে পাকা রাস্তার মাথায় এসে পৌঁছাই। শবে মাত্র সূর্যের বাহাদুরি শুরু। এই বাহাদুরি সারাদিন থাকলে ভালোই হয়। কাদা রাস্তা কিছুটা শুকাবে। কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টিতে রাস্তার একদম লাজুক অবস্থা।
হেঁটে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলছি। রাস্তার কাদা কিছুটা শুকিয়েছ। গতকালও মনে হয় সূর্যের বাহাদুরি ছিলো। সবাই আগে থেকেই পায়ের জুতা খুলে হাতে নিলেও কায়েস খুলে নাই। ও প্রমাণ করতে চায় জুতো পায়েই বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাবে।

বেচারার সেই আশা আর পূরণ হলো না। অর্ধপথ এসে জুতো খুলতে হলো। কয়েকটা রেইনট্রি গাছে রাস্তা এমনভাবে আড়াল দিয়ে রেখেছে সূর্যের বাহাদুরি এখানে চলে না। এই পথ শুকাতে হলে আরো কয়েকটা দিন গুনতে হবে।

বাড়িতে এসে স্বাভাবিকভাবে আম্মা রান্নার কাজে লেগে গেলো।

কায়েস গোসল করে ঘুমের রাজ্যে চলে গেলো। শিলা ওর রুমে গিয়ে দরজা আটকিয়ে দিলো, শিলাও মনে হয় ঘুমে চলে গেছে। সবাইকে স্বাভাবিক দেখতে পেয়ে ভালো লাগছে।

অধ্যায়-১২

কিছু মানুষ সব ফসকাতে পারে কিন্তু কাউকে অপমান করার সুযোগ পেলে তা কখনো ফসকাবে না। কিছুদিন যাবৎ আমাদের বাড়িতে লোকের আসা যাওয়া। একজন এসে বললো, "ভালো একটা সম্বন্ধ ছিলো। তোমার মেয়ের কথা জানতে পেরে তারা না করে দিছে।"
আরে না করছে করুক সেটা এসে বলার কি দরকার!
এক বয়স্ক লোক এসে বললো, "সুলতান সাহেবের ঘরে এইরকম মেয়ে কল্পনাও করতে পারি নাই। ছিঃ!"
গ্রামের ঝি বউরা শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, "মেয়েটার লাজ শরম বলতে কিছু নাই, এখনো কেমনে বাঁইচা আছে। আমি হইলে কবে বিষ খাইয়া মইরা যাইতাম।"
যুবক ছেলেরা বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় কুৎসিত ভাষায় চিৎকার চেঁচামেচি করে।
স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পর আম্মার কাছ থেকে এইসব শুনতে হয়। শুনে চুপচাপ থাকি।
এসবের প্রতিবাদ করার মতো ক্ষমতা শিলা বন্ধ করে দিয়েছে। এখন দাঁত চেপে সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই।

রাতে ঘুম আসছে না। একটু ঘুম পাওয়ার লোভে অনেকক্ষণ ধরে ডান কাত হয়ে শুয়ে আছি। মাথার উপর শাঁই শাঁই করে ফ্যান ঘুরছে। হঠাৎ শিলার রুম থেকে কিছু পড়ে যাওয়ার আওয়াজ হলো।
বিড়াল হয়তো, পাশের বাড়ির হোলা বিড়ালটা প্রায় রাতে আমাদের ঘরে থাকে। ইঁদুরের পিছু নিতে নিতে ঘর লণ্ডভণ্ড করে তুলে।

চোখ ঘোলাটে হয়ে আসছে, আর কিছুক্ষণ পর হয়তো ঘুমের জগতে তলিয়ে যেতাম।
আম্মার চিৎকারে অপরিপক্ক ঘুম ভেঙে গেলো। তাড়াহুড়ো করে

অন্ধকার রুমে বাতির সুইচ খুঁজে জ্বালালাম।
তারপর আম্মার রুমের দিকে দৌড়ে গেলাম।
আম্মা সেখানে নেই, কান্নাটা শিলার রুম থেকে আসছে। বুকটা ধকধক করে উঠলো। শিলার রুমের দিকে দৌড়ে গেলাম।
শিলা অদ্ভুত জাদুর বলে মাটির উপরে পা না রেখেই হাওয়ায় টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শিলার পা ধরে আম্মা চিৎকার করেই যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর কায়েস ছুটে এসে হাউমাউ করে মাটিতে শুয়ে পড়লো।
আমি এক দৃষ্টিতে শিলার দিকে চেয়ে নিথর হয়ে দাঁড়িয়েই ছিলাম।

***

শিলার জানাজা পড়াতে মোল্লা, মৌলভী কেউ আসেনি। সবার মুখে এক কথা, মেয়েটা কলঙ্কিত, তাছাড়া আত্মহত্যা মহাপাপ, এই ব্যক্তির জানাজা দেওয়া যায় না।

তারপরও ভাই হয়ে বোনের জানাজা না পড়িয়ে মাটিতে শোয়াই কি করে। স্কুলের হেড স্যারের ইমামতিতে জানাজায় উপস্থিত ছিলো কায়েস, সবুজ, চায়ের দোকানদার হারুন মামা, ফিরোজ ভাই।
শেষ ভাগে হানিফ ও বাচ্চু কোথা থেকে দৌড়ে এসে উপস্থিত হয়।
তারপর কবরস্থানে দাফন কাজ সম্পন্ন করে ঘরে ফিরে আসি।

এর আগে ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশ লাশ নিতে আসলে চেয়ারম্যান প্রাথমিক পর্যায়ে আমাকে বলে দেয়,

"কিছুতেই লাশ পুলিশের কাছে না দিতে। এই গ্রাম থেকে কোনো লাশ পুলিশের কাছে গেছে এইরকম নজির নেই। আমি পুলিশকে ভালোভাবে বুঝাচ্ছি এটা হত্যা নাকি আত্মহত্যা। শেষে তারা তোমার কাছে আসবে তুমি লাশ দিতে অস্বীকার করবে। এটা হত্যা হলে তো ময়নাতদন্তের দরকার ছিলো। যেহেতু আত্মহত্যা তাই কাটাছেঁড়ার

কোনো দরকার নেই।"

থানার এসআই আমার কাছে আসলে আমি আবেগী হয়ে না বলে দেই। যা হওয়ার হইছে এখন পানি ঘোলা করে কি লাভ!

এসআই চেয়ারম্যানের কথার উপর জোর করে নি। আমার কাছ থেকে অনুমতি পেলে জোর খাটাইতে পারতো। তারা চলে গেলো।

মা, কায়েস কেঁদেই যাচ্ছে। খাদিজা আপা তাদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন। আড়ালে গিয়ে তিনিও কাঁদছে।
মুন্নি বারবার বলছে, "আনতিকে ঐ জঙ্গলে রেখে আইছো কেনো?"
তন্নিকে বোঝানোর মতো উত্তর আমাদের কাছে নেই। চোখের পানিতে ও যা বুঝে নেয়।
সবুজ ও ফিরোজ ভাই সামনের বারান্দায় বসে আছে। সবুজ মাঝে মাঝে আমার দিকে নজর রাখছে। এমন দৃষ্টি যেনো আমি ফুড়ুৎ করে কোথাও হারিয়ে না যাই। যাবোই বা কেমনে! বাচ্চু ও হানিফ সারাক্ষণ আমার সাথে আঠার মতো লেগে আছে। সন্ধ্যায় চলে যেতে পারে। তবে ওরা পুরোটা দিন এমনভাবে আমায় সঙ্গ দিচ্ছে যেনো এই বাড়ির অনেক পুরাতন সদস্য তারা।
কিছুতেই আমায় চোখের আড়াল হতে দেয় না। গ্রামের লোকদের চাইতে ওদের আপন মনে হইতেছে বেশি। খারাপ সময়ে গ্রামের লোকদের পাশে পাই নাই, সেখানে ওদের আশা না করা সত্ত্বেও ওরা পাশে আছে।

হানিফ একটু চোখের আড়াল হয়ে যাওয়ার ফাঁকে বাচ্চু আমায় বললো,

"ভাই সাব আপনার কষ্ট আমি বুঝি, বোন হারায়া গেলো যে কতো কষ্ট তা যাদের হারায় তারা বুঝে। আমারও এইরকম কষ্ট হইছিলো, এখন দেখছেন না সব ভুলে গিয়ে নিজের মতো আছি।
আল্লাহ এক এক কইরা সবাইরে নিয়া যাইবে। এটাই আল্লাহর লীলা খেলা। এটা নিয়া দুঃখ কইরেন না ভাই সাব।"

বাচ্চুর চোখে অবুঝ শিশুর মতো পানি এসেছে। সে পানি কাঁধের গামছা দিয়ে মুছতে লাগলো। তারপর কিছু বলতে গিয়েও বললো না। আমারও গাল বেয়ে পানি পড়ছে। পরুক। মিশে যাক মিত্তিকার তরে, মুছে যাক অবসাদ।

অধ্যায়-১৩

বাচ্চাদের পরীক্ষা শেষ তাই স্কুল কিছুদিনের জন্য বন্ধ। ঘরে শুয়ে বসে সময় কাটাই। ফাঁকে টিউশনি করি। গনি মিয়া টাকার জন্য অনেক তাগাদা দিতে লাগলো। তাই হেড স্যারের কাছ থেকে আরো বিশ হাজার টাকা ধার এনে পুরোটা পরিশোধ করে দিয়েছি। হেড স্যারকে আস্তে আস্তে পঁচিশ হাজার টাকা ফেরত দিয়েছি। এখন মোট পঁইতাল্লিশ হাজার টাকা পাবে। এই টাকাও আস্তে আস্তে দিতে পারবো। স্যার আমাকে অতোটা চাপ দিবে না। কায়েসের মাধ্যমিক পরীক্ষাও কাছাকাছি চলে আসছে। তাই টাকা জোগাড় করার দ্বিতীয় বিকল্প টিউশনি করতেই হবে।

বেশিরভাগ ছাত্র ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত। সারাদিন বীজগণিত, পাটিগণিত ও ইংরেজি ব্যাকরণে আটকে থাকতে হয়। তাই মাঝে মাঝে ফুরফুরে মেজাজি হতে সবুজের সাথে আড্ডা দিতে যাই। আজকেও গিয়েছিলাম। হারুন মামার চায়ের দোকানে বসে আছি। হারুন মামা চায়ের কাপ নাড়তে নাড়তে বললো,

"শুনলাম এবারো নাকি মোশাররফ মিয়া ইলেকশন করবে?"
আমি কিছু বলতে যাবো। আমার মুখ থেকে সবুজ কথা কেড়ে নিয়ে বললো, "করুক, সব সময় সবাই যেহেতু ভোট দেয় তাহলে তো ভালোই মানুষ। একজন ভালো মানুষ এলাকার চেয়ারম্যান থাকলে তো দোষের কিছু না।"

"আরে বাবা, সেরকমভাবে বলছি না, মাঝখানে শুনছিলাম উনি ইলেকশন করবে না তাই জিজ্ঞেস করলাম এই আর কি!"

আমি সবুজের দিকে তাকিয়ে বললাম, "কেমনে ভালো মানুষ শুনি? এখন পর্যন্ত রাস্তাটা পাকা করে দিতে পারে নাই। বর্ষাকালে আমাদের কি দুর্দশা হয়! তারপরও বলবি ভালো মানুষ!"

সবুজ হাসতে হাসতে বললো, "সেটা ভালো কাজ করে নাই। মানুষ তো ভালো, না হইলে সবাই ওনাকে ভোট দিবে কেনো?"

সবুজের কথায় হারুন মামা হেসে দিলো কিন্তু আমি তার সাথে তাল মিলালাম না। ভুরু কুঁচকে ঠোঁট কামড়ে ভাবতে লাগলাম, কাজ না করা সত্ত্বেও সবাই কেনো ওনাকে ভোট দেয়! আমার ভাবনাটা বুঝি হারুন মামা ধরতে পারলো। তিনি আমার দিকে ফিরে বললো, "এর আগের ইলেকশনে এলাকায় ছিলেন?"

"না।"

"এই জন্যই আপনি কিছু জানেন না। আসলে চেয়ারম্যান ইলেকশনের আগের রাতে সবার ঘরে গিয়ে টাকা দিয়ে আসে। এতেই পরের দিন সবাই তাকে ভোট দেয়। আর চেয়ারম্যান থাকাকালীন তো জনগণকে খুশি করা লাগে, তাই এলাকায় ত্রাণ আসলে সবাইকে ত্রাণ দিয়ে খুশি রাখে। সেটাতেও গলদ আছে। কেউ ত্রাণ পাবে তিন বার, সেখানে তাকে দেওয়া হয় একবার। এতে এলাকার মানুষদের কাছে উনি জনদরদী। ওইদিকে যে বাকি টাকাগুলো খেয়ে ফেলে, সেটা কেউ বুঝে না।"

আমি হারুন মামার কথায় অবাক হয়ে তাকিয়ে বললাম, "আপনি এতো কিছু জানেন কেমনে?"

উনি নিজের বুকে বীরের মতো হাত রেখে বললো, "দোকানদারি করলে কি হইছে! সবকিছু জানি। ঐ যে ফারজানার লাশ নিয়ে একটা কাহিনি হলো, আমাগো গ্রামের মানুষ তো মূর্খ। পুলিশের কাছে লাশটা দিলে তারা ময়নাতদন্ত করে অপরাধী ব্যক্তির সন্ধান করতো। দিলোনা লাশটা নিতে। আর চেয়ারম্যান তো জানে, লাশ দিলে আসল অপরাধী বেরিয়ে আসে। তারপরও চেয়ারম্যান সেটা না করে গ্রামের মানুষদের সাথে তাল মিলালো। এতে এলাকার লোকদের কাছে উনি আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। সব রাজনীতির চাল, সব রাজনীতির চাল!"

সবুজ হারুন মামার কথায় তেমন প্রতিক্রিয়া দেখালো না। মনে হয় সবুজ আগে থেকেই সব বুঝে। তবে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। কারণ রাজনীতি সম্পর্কে আমার জ্ঞান শূন্য।

***

এবার মোশাররফ মিয়ার নির্বাচনে জয়লাভ করতে হলে অনেক বেগ পোহাতে হবে। কারণ তার বিপক্ষে নির্বাচন করছেন জয়নাল শরীফ। মোশাররফ মিয়ার বিপক্ষে প্রতি নির্বাচনেই প্রার্থী ছিলো। তবে তারা অতটা শক্তপোক্ত নয়। জয়নাল শরীফ এই প্রথম নির্বাচন করছেন। তার শহরে কয়েকটা কলকারখানা আছে। সেখানে এলাকার কিছু বেকার লোকদের আয়-রোজগারের ব্যবস্থা করেছে। এই খাতিরে এলাকার লোকজন তাকে অনেক সম্মানের চোখে দেখে। এবার তার শখ উঠেছে এলাকার লোকজনদের সাহায্য-সহযোগিতা করা। এলাকায় কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করা, যা মোশাররফ মিয়ার গাফিলতিতে পড়ে আছে।

এলাকাবাসী এখন দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। তারা জনদরদী মোশাররফ মিয়াকে হারাতে চান না। আবার শহর থেকে হঠাৎ উড়ে আসা আরেক জনদরদীকেও হারাতে চান না। সবুজের কাছে শুনলাম ওর পাশের বাড়ির ভাই ও ভাবি ভোট ভাগাভাগি করে রেখেছে। তারা দুজন দুজনকে ভোট দেবে।
চায়ের দোকানে আড্ডার বিষয় মোশাররফ মিয়া আর জয়নাল শরীফ। সারাদিন মাইকিং হয়, উঠানে উঠানে বৈঠক হয়। মিটিং শেষে পলিথিন ভর্তি মুড়ি ও জিলাপি বিতরণ করা হয়। এলাকার ফয়েজ পাগলা ঘুরে ফিরে দুই পক্ষের বৈঠকে উপস্থিত থেকে মুড়ি-জিলাপির ভাগ নেয়।

মোশাররফ মিয়া শুরুর দিকে এলাকার চ্যালাপ্যালা যুবক ছেলেদের নিজের দলে ভিড়িয়ে নিয়েছে। তাদের হাতে দুই টাকার বিড়ি দিলেই

তারা খুশি। তাহলেই রাস্তায় রাস্তায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলবে,

"মোশাররফ মিয়া চায় কি?"

"জনগণের শান্তি।"

"আমার ভাই, তোমার ভাই!"

"মোশাররফ ভাই, মোশাররফ ভাই।"

অন্যদিকে জয়নাল শরীফ কিছু গণ্যমান্য লোক নিয়ে মাঠে নেমেছে। তাদের মধ্যে প্রাইমারি স্কুলের হেড স্যার অন্যতম। তারা এ বাড়ি ও বাড়ি গিয়ে ভোট ভিক্ষা চায়। তার দলে যুবক ছেলেপেলে নেই বললে ভুল হবে। সবুজ ওর সাথে কিছু ছেলেপেলে মিলে জয়নাল শরীফের সাথে মাঠে নেমেছে। সবুজ আমাকে বলেছিলো জয়নাল শরীফের পাশে থাকতে। কিন্তু আমি সবসময় নিরিবিলি থাকতে পছন্দ করি, তাই এসবে জড়াইনি। তবে মাঝে মাঝে উঠান বৈঠকে যাই। যেতে হয়, না হলে সবুজ আমার ওপর চওড়া হয়ে থাকে। সবুজ সবসময় একটা কথা বলে,

"মোশাররফ মিয়া টানা দুইবার নির্বাচন করেও এলাকার কোনো উন্নয়ন করে নাই। তারপরও লোকজন তাকে ভোট দেয়। কারণ তিনি সবাইকে অন্ধ বানিয়ে রেখেছে। এটা থেকে আমাদের পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় জয়নাল শরীফ চাচার সাথে মাঠে নামা।"

আমি সবুজকে বলে রেখেছি, "ভোট জয়নাল শরীফ চাচাকেই দিবো। কিন্তু মাঠে নামতে পারবো না।" এতে সবুজ আমার উপর একটু রাগ। এই রাগ কমাতে আমি মাঝে মাঝে উঠান বৈঠকে উপস্থিত থাকি।

আজ হেড স্যারের বাড়িতে উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। সন্ধ্যা থেকে লোক ভিড় করতে লাগলো। আমি একটু আগেভাগে গেলাম। সবুজকে অনেক ব্যস্ত দেখাচ্ছিলো। দ্রুত চেয়ার গোছাচ্ছে যাতে কারো এসে দাঁড়িয়ে থাকতে না হয়। কিছু ছেলেরা আপ্যায়নের কাজে লেগে গেলো। কেউ আসলেই আদর-আপ্যায়ন করে তাদের বসিয়ে দেয়। জয়নাল শরীফ আর কিছুক্ষণ পর আসবে। এর

মধ্যে উঠানে দু-একটা ছোটখাটো মিছিল এসে পৌঁছেছে। মহিলারা আড়াল থেকে দেখছে। কেউ ঘরের জানালা দিয়ে, কেউ দরজা একটু ফাঁকা করে। আমি অবলা প্রাণীর মতো একটা চেয়ার নিয়ে বসে পড়লাম।

জয়নাল শরীফ ও তার নির্বাচনী সঙ্গীরা উঠানে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে যুবক ছেলেদের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, "জয়নাল ভাইয়ের আগমন।"

"শুভেচ্ছার স্বাগতম।"

এক এক জনের পর এক এক জন বক্তব্য রাখছে। সবাই মোশাররফ মিয়াকে একটু একটু করে ধুয়ে দিচ্ছেন। সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করছে মোশাররফ মিয়া এর আগে অনেক টাকা মেরে খেয়েছে। তিনি এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ করেননি। আর নেশা-পানি দিয়ে এলাকার যুব সমাজ ধ্বংস করেছে। অন্যদিকে জয়নাল শরীফের প্রশংসায় ভরপুর, যেন এই মাত্র আসমান থেকে ফেরেশতা নেমে এসেছে।

শেষ বক্তা জয়নাল শরীফ। তার হাতে মাইক্রোফোন তুলে দেওয়ার পর তিনি উপস্থিত সবাইকে সালাম দিয়ে এর আওয়াজ জোরালো শোনার জন্য অপেক্ষা করলো। কিন্তু উপস্থিত ব্যক্তিদের সালামের জবাব অতটা জোরালো হলো না। আমি নিজেও ম্যানম্যানিয়ে বলেছি। তিনি আবার অনেকটা উঁচু কণ্ঠে সালাম দিলো। এবার উপস্থিত জনতা তার চেয়েও জোরালো উত্তর দিয়ে প্রমাণ করলো সবার গলা অক্ষত আছে। জয়নাল শরীফ তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে বললো,

"সবাই ভালো তো?"

"জি..."

পিছনের ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললো, "চেয়ার অনেক খালি আছে, তোমরা বসে পড়ো।"

ছেলেরা তার কথার অবাধ্য না করে গুরমুর করে বসে পড়লো।

তিনি সবার দিকে একটু নজর দিয়ে বলতে লাগলো, "আপনারা জানেন আমি ব্যবসার খাতিরে অনেক আগে থেকে ঢাকা থাকি। ওখানে কয়েকটা মিল-কারখানা আছে, ঐগুলা দেখাশোনা করতে হয়। তারপরও শেকড়ের একটা টান থেকেই যায়। আমার বেড়ে ওঠা এই এলাকায়। এই এলাকায় কত ঘুরছি-ফিরছি, আড্ডা দিয়েছি। হেড স্যারের দিকে তাকিয়ে বললো, "এই আপনাদের সবার প্রিয় স্যার। তার সাথেও কত আড্ডা দিয়েছি। এইগুলা আমি শহরে থেকে ভুলতে পারি না। নিয়মিত এই এলাকার খোঁজখবর নেই। শুনলাম এই এলাকায় অনেক ছেলে বেকার দিন কাটাচ্ছে। আমি নিজে তাদের ঢাকায় নিয়ে কাজের ব্যবস্থা করেছি। একটা জিনিস আমাকে বড়োই মর্মাহত করেছে। আমাদের এলাকায় কাঁচা রাস্তাটা এখন পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। সরকার যে রাস্তার জন্য টাকা দেয় নাই, এমন কিছু না। এই টাকাগুলো যায় কোথায়? এর পেছনে দায়ী কে? গতবার শুনলাম রাস্তার কাজ খুব শিগগির শুরু হবে। কই, এখন পর্যন্ত রাস্তায় একটা ইটের দেখা পেলাম না। আমি এই সমস্যা দূর করতে চাই। আমি এই এলাকার মানুষদের সাহায্য করতে চাই। তার আগে আপনাদের সাহায্য আমার দরকার। তাই আপনারা ভোটটা দয়া করে আমাকে দিবেন। আপনারা মোশাররফ মিয়াকে ভোট দিয়ে একই ভুল বারবার করে এই সমস্যায় জর্জরিত হবেন না।"

পাশ থেকে একজন স্লোগান দিতে লাগলো, "জয়নাল ভাই চায় কি?"

"জনগণের শান্তি।"

"আমার ভাই, তোমার ভাই!"

"জয়নাল ভাই, জয়নাল ভাই।"

হেড স্যার দাঁড়িয়ে উপস্থিত জনতার সম্মতি জানতে চাইলো। তারা হাত উঠিয়ে জয়নাল শরীফকে ভোট দিবে বলে আশ্বস্ত করলেন।

অধ্যায়-১৪

আর মাত্র কয়েকদিন পর ভোটকেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। মোশাররফ মিয়া ও জয়নাল শরীফ সমান তালে নির্বাচনী বার্তা প্রচার করছেন। কে জিতবে?

কেউ কেউ বলছে জয়নাল শরীফ যতই ভালো মানুষ থাকুক, মোশাররফ মিয়ার সাথে টেক্কা দিয়ে পারবে না। মোশাররফ মিয়া বড়ই চতুর। কোথা দিয়ে কী করবে কেউ টের পাবে না। শেষ পর্যন্ত গোল মোশাররফ মিয়াই দিবে।

অনেকদিন ধরে নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছি। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছি। সিগারেট একটা ছিল, তা কিছুক্ষণ আগে শেষ করেছি। কায়েস ও আম্মা যার যার রুমে গভীর ঘুমে লিপ্ত। হঠাৎ দরজার কাছে কারো কাশির আওয়াজ পেলাম। নিশ্চিত হতে কান খাড়া করলাম। হ্যাঁ, কেউ দরজার কাছে আছে। তবে গলার সুরসুরির জন্য কাশছে না, দরজা খোলার জন্য ইঙ্গিত। আমি মোবাইলের বাতি জ্বালিয়ে সতর্কভাবে দরজার কাছে গিয়ে বললাম, "কে ওখানে?"

ওপাশ থেকে ছোট কণ্ঠে বললো, "আমি তোমার চাচা, মোশাররফ মিয়া।"

দ্রুত দরজা খুলে দেখলাম তিনি একা না। তার সাথে দুইজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। একজন বাবলু, চেয়ারম্যানের ভাই। আরেকজন সৈকত, বাবলুর খুব কাছের বন্ধু। আমি মোশাররফ মিয়ার উদ্দেশে বললাম, "এই সময়ে এখানে? আসুন ভিতরে আসুন।"

"না, বসতে আসি নাই। তোমার আম্মা ঘুমাচ্ছে বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"ও, আচ্ছা, তাকে একটু ডাক দাও, বলো আমি তার সাথে কথা বলতে এসেছি।"

আম্মাকে ঘুম থেকে ডেকে তুললাম। তিনি নিজেকে প্রস্তুত করে ঘুম কাতর কণ্ঠে বললেন, "কে এসেছে?"

"মোশাররফ মিয়া।"

মুহূর্তে আম্মার মুখটা রাগে গজগজ করতে লাগলো। বললেন, "গিয়ে বল, সে ঘুমোচ্ছে, দেখা করতে পারবে না।"

"এতো রাতে দেখা করতে এসেছে। মনে হয় ভোটের ব্যাপারে কিছু বলবে। আপনি শুধু হ্যাঁ হ্যাঁ বলবেন। তারপর ভোটকেন্দ্রে গিয়ে আপনার ইচ্ছেমতো যাকে খুশি ভোট দেবেন। তাকে এখন ফিরিয়ে দিলে খারাপ দেখায়।"

আম্মার রাগ এখন চরম পর্যায়ে। তিনি বললেন, "দেখা করবো না, ব্যস করবো না।"

আমি ব্যর্থ হয়ে রুম থেকে বেরুতে যাচ্ছি, এর মধ্যে আম্মার পিছন থেকে ডাক শোনা গেলো। যাক, অবশেষে তিনি মোশাররফ মিয়ার সাথে দেখা করতে রাজি।

আম্মা মোশাররফ মিয়ার সামনে আসার পর তিনি আম্মার কাছে হাত জোড় করে বললেন,

"ভাবি, ভুল-ত্রুটি যা করেছি, মাফ করে দিয়েন। ভোটটা আমাকে দেবেন, দয়া করে।"

আম্মা তার কথায় কিছু বললেন না। তার হয়ে আমি বললাম, "আচ্ছা, দেবে হানে। এখন রাত অনেক হয়েছে, বাড়িতে গিয়ে ঘুমান।"

"কেমন করে ঘুমাই, বাবা! জয়নাল শরীফ যা শুরু করেছে, শুধু শুধু আমার নামে আবোল-তাবোল বলে বেড়াচ্ছে। আমি খারাপ নাকি ভালো, তা এলাকার মানুষ জানে। আমার নামে নিন্দা ছড়িয়ে সে কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসতে চাইছে!"

তার কথায় আমি চুপ হয়ে আছি। বলার মতোও কিছু নেই। জানি মোশাররফ মিয়া অনেক টাকা মেরে খেয়েছে। এখন এই মুহূর্তে তো তার সামনে বলা যাবে না, জয়নাল শরীফ আপনার নামে যা বলছে ঠিকই বলছে। এখন এই অপ্রিয় সত্য কথা বলতে গেলে অনেক ঝামেলা পেকে যাবে। আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ না হলে বলেই দিতাম। নীরবতা কাটাতে বাবলু আমার দিকে চেয়ে বললো, "আচ্ছা তাহলে যাই, আমাদের দিকে একটু খেয়াল রাখবেন।"

"আচ্ছা।"

মোশাররফ মিয়া ও তার সাথের দুইজন আবছা আলোতে চলে গেলো। আমি দরজা আটকে রুমে গিয়ে শুয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। গিয়ে দেখি আম্মা আমার খাটের পাশে বসে আছে আর রাগে গজগজ করছে। আমি বললাম, "এখানে বসে আছেন কেনো? ঘুমাতে যান।"

"জানিস, মোশাররফ মিয়া ভোট চাইতে আসে নাই। ভয় দেখাতে এসেছে।"

ভুরু কুঁচকে বললাম, "মানে?"

"আমি ঐ মোশাররফ মিয়াকে এখানেই গলা টিপে খুন করতাম। কিন্তু ওর সাথের দুইজনের সাথে অস্ত্র ছিল, তারা তোকে কিছু করে ফেলতো, তাই চুপ ছিলাম।"

"আম্মা, আমি আপনার কথার কিছুই বুঝতে পারছি না। সবকিছু খুলে বলুন।"

"ভাবছিলাম, আমি তোকে কিছুই বলবো না। কিন্তু সবকিছু যখন হারিয়ে ফেললাম, না বলে কী লাভ!" তার চোখে পানি এসে গেছে, কিন্তু তা গড়িয়ে পড়ছে না। হয়তো কোনো জাদুটোনা দিয়ে চোখের পানি চোখেই আটকে রেখেছে। আমি তার আরো কিছু বলার অপেক্ষায় আছি। একটু নিশ্বাস নিয়ে বলতে লাগলেন,

"তুই ঢাকা যাওয়ার দুইদিন পর কায়েস ওর বন্ধুর বাড়িতে গেলো। তুই বাড়ি থাকলে তো কোথাও যায় না। তাই তুই বাড়িতে না থাকায় ও এই সুযোগটা হাতছাড়া করে নাই। তোকে আমি একদিন বলছিলাম মোশাররফ মিয়া তোর বাবার কাছে এক লাখ টাকা পাবে। তোরা

যেদিন বাড়িতে ছিলি না, সেদিন মোশাররফ মিয়া ও তার সাথে কয়েকজন টাকা চাইতে আমাদের বাড়িতে আসে। তখন ওরা..." আম্মা থেমে গেলেন। তার নিস্তব্ধতার জায়গা দখল করলো কান্না। তিনি কান্না করেই যাচ্ছেন। তার এই অল্প কথাই আমার মনে গভীরভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে। আমি ভয়ানকভাবে বললাম, "তারপর কী হইছে?"

"ওরা আমাকে আর তোর আব্বাকে বেঁধে শিলার রুমে গিয়ে শিলাকে...। শিলা ওদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু আর শেষ রেহাই হলো না। পরে শিলার ঐ অবস্থা দেখে তোর আব্বা ওখানেই স্ট্রোক করেন। মোশাররফ মিয়া যাওয়ার সময় বলে গেছে এসব যদি আর কেউ জানতে পারে, তাহলে তোর আর কায়েসের অবস্থা করুণ হবে। আর এটাও বলেছে এই রকম নজির তার আরো আছে। ফারজানাকে তিনি ধর্ষণ করে মেরে নদীতে ডুবিয়ে দেয়। দোকানদার হারুনের মেয়েকেও মেরে ফেলে। মোশাররফ মিয়া যাওয়ার এক ঘণ্টা পর তোর আব্বা মারা যান। শিলা তখন রুমেই পড়ে ছিল। সবাই শিলাকে দেখে ভাবতো বাবা মরার শোকে এই অবস্থা। কিন্তু শিলা তার পরদিন জানে, তার বাবা পৃথিবীতে নেই। শিলার পেটে যাতে বাচ্চা না আসে, তার জন্য কত কিছু করলাম। শিলার বান্ধবীকে দিয়ে দূর থেকে ওষুধ এনে খাইয়েছি। তারপরও মেয়েটার কী দুর্ভাগ্য! শেষমেষ আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে যেতে হলো। শিলাকে আমি কয়েকবার বলেছি, তোকে সবকিছু জানিয়ে দেই। ও তখন নিষেধ করে বলেছে, না, ভাইয়া যদি এসব জানতে পারে, তাহলে মাথা গরম করে ওদের সামনে যাবে। তখন ওরা যদি কিছু করে ফেলে! থানায় যেতে চাইছিলাম, তাও শিলা বাধা দেয়। বলে, পুলিশ তল্লাশির জন্য এলাকার মানুষদের কাছে আসবে। তখন এলাকার মানুষ মোশাররফ মিয়ার বিপক্ষে কোনোদিন কথা বলবে না। উল্টো আমাদেরই ঝামেলা পোহাতে হবে। এই জন্য ভাইয়া ও কায়েস মোশাররফ মিয়াদের কবলে পড়ে যাবে। শিলা এতদিন ওদের ভয়ে তোকে কিছুই বলে নাই।"

আম্মার মুখ থেকে এসব শোনার পর মেঝেতে লেপ্টে বসে পড়েছি। চোখে পানি ধরে রাখার মতো জায়গা নেই, তাইতো বুক ভিজে যাচ্ছে। এর জন্য শিলাকে কতই অবহেলা করেছি, কত খারাপ কথা শুনিয়েছি। গায়ে হাত পর্যন্ত তুলেছি। তারপরও শিলা আমাদের কথা চিন্তা করে এতদিন মুখ বুজে ছিল!

অধ্যায়-১৫

মোশাররফ মিয়ার লাশ দেখতে আশেপাশের আঠারো গ্রামের লোক ভেঙে পড়েছে। এইরকম নৃশংসভাবে খুন এই ইউনিয়নে প্রথম হলো। চোখ উপড়ে ফেলেছে। নাড়িভুঁড়ি সব ছুরি দিয়ে এলোমেলো করে দিয়েছে। দু'হাতের কব্জি কাটা। এইরকমভাবে মোশাররফ মিয়ার লাশ পড়ে থাকতে দেখে আমি পৈশাচিক আনন্দ পাচ্ছি।

বেচারার কী কপাল, চেয়ারম্যান হওয়ার তিন দিনের মাথায় চলে গেলো। নির্বাচনের দিন তিনি বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। এতটা ভোট কারা দিলো তা জয়নাল শরীফসহ সবাইকে অবাক করে। কে খুন করেছে, তা সবার কাছে একরকম রহস্য। তবে যে খুন করেছে, তাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে ইচ্ছে করছে। কারণ খুনটা আমি করতে চাইছিলাম। তার আগেই একজন এসে লক্ষ্যটা পূরণ করে দিয়ে গেলো। এ যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি।

থানার ওসি ও এসআই ছুটে আসলেন। লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় এলাকার সবাইকে বলে গেছেন, কেউ যাতে কোথাও না যায়, তাহলে তার অবস্থা করুণ হবে। এই কেসের নিখুঁত তদন্ত হবে। জয়নাল শরীফকে বিশেষভাবে নজরে রাখা হচ্ছে। কারণ এই কেসটা অনেকটা তার দিকে ঝুঁকছে। চেয়ারম্যান না হওয়ার প্রতিশোধে মোশাররফ মিয়াকে খুন করেছে বলে কেউ মনে করে। তবে জয়নাল শরীফ এটা পুরোপুরি অস্বীকার করছে। তিনি অভিযোগ করেন, তাকে শুধু শুধু হয়রানি করা হচ্ছে। আমি ঠিক করে রাখলাম, জয়নাল শরীফ যদি তাকে খুন করে থাকে, তাহলে গোপনে তাকে সালাম করে আসবো।

এলাকা কয়েকদিন ধরে নিঃস্তব্ধ। কাক পক্ষীও চুপ হয়ে গেলো। সন্ধ্যার আগে সবাই বাজার থেকে ফিরে আসে। সবার মনে আতঙ্ক বিরাজ করছে, পুলিশ কখন কাকে ধরে নিয়ে যায়।

স্কুল থেকে ফিরে এসে বিকালে দরজার কাছে বসে আছি। এমন সময় আম্মা এসে হঠাৎ করে বললো,

"আমি জানি তুই আমাকে মিথ্যা বলবি না। একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?"

"কি?"

"খুনটা কি তুই করছিস?"

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, "না, তবে করতে চাইছিলাম। তার আগেই কে যেন করেছে। যে করেছে, আমি তাকে সালাম করবো।"

"অন্য কেউ তাকে কেন খুন করতে যাইবে?"

"তার মানে তুমি বলতে চাও খুন আমি করেছি? উনি যে আমাদের পরিবারে অত্যাচার চালাইছে এমন না। আমাদের মতো এইরকম জোয়ার আরও পরিবারের উপর দিয়েও যেতে পারে। তারাও তো খুন করতে পারে। আর যদি আমি খুন করতাম, এতটা নৃশংসভাবে করতে পারতাম না।" কথাটা বলতে বলতে থেমে গেলাম। হঠাৎ ঐ রিকশাওয়ালা যুবকটার কথা মনে পড়লো। যুবকটি সেদিন প্রতিশোধের কথা বলেছিলো। তবে কি মোশাররফ মিয়াকে হত্যার উদ্দেশ্য ছিলো! সিদ্ধান্ত নিলাম, যুবকটি যদি খুন করে থাকে, আমি তাকে একবার হলেও জড়িয়ে ধরবো। আমি যেটা পারিনি, সেটা যুবকটি করে দেখিয়েছে।

কায়েস স্কুল থেকে ফিরে আসছে। কাছে এসে আস্তে আস্তে বললো,

"ভাইয়া, জয়নাল শরীফকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। খুন নাকি জয়নাল শরীফ করেছে।"

কায়েসের চোখে কৌতূহলের ছাপ। ছোট ভাইয়ের সাথে এসব বিষয় নিয়ে কথা বলা যাবে না। আমি ভুরু কুঁচকে বললাম,

"তোর এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। দুপুরে খাস নাই, যা খেতে বস।"

কিসের জয়নাল শরীফ, মাথায় শুধু যুবকটির কথা ঘুরছে। যুবকটিকে খোঁজার কাজে লেগে গেলাম। পাকার মাথা, বাজার, বাস স্টেশন কোথাও পেলাম না। থাকার কথাও না। সে যে উদ্দেশ্যে এসেছে, সেটা তো হয়ে গেলো।এখন এই এলাকায় থেকে কী লাভ! আচ্ছা, যুবকটির বাড়ি যেন কোথায় বলেছিলো? মিঠাচর। দেরি না করে পরের দিন ভোরে মিঠাচরের দিকে রওনা হলাম। হাশেমপুর থেকে চার গ্রাম পর ছোটখাটো একটা নদী পার হতে হয়। এরপর মিঠাচর। নৌকা নিয়ে নদী পার হওয়ার সময় মাঝিকে জিজ্ঞেস করলাম,

"আচ্ছা, এখানের কোনো ছেলে আছে যে রিকশা চালায়?"

"রিকশা তো অনেকেই চালায়। তয় কোনো পোলাপানগো চালাইতে দেখলাম না। আচ্ছা, যে ছেলের কথা কইছেন, তার বয়স কতো? খোঁজ নিয়ে দেখতে পারমু।"

"বাইশ থেকে তেইশ বছর হবে।"

"ও, তায় তার সাথে আপনার কাম কী?"

"একটু কথা বলতে হবে।"

নৌকা ভেড়ানোর পর ভাড়া জানতে চাইলাম। বললো,

"টাহা লাগবে না, এই নৌকা দিয়া জাল বাই। আমনে ওপার দাঁড়াইয়া রইছেন তাই এপার আইনা দিলাম।"

ও, তাহলে সচরাচর মানুষ পারাপার করে কোথা দিয়া?"

"এই এলাকায় তেমন মানুষের আওয়াজ-যাওয়া নাই। দু একজন ঈদের চান্দের মতো আইয়া পড়ে। তারপরও একজন আছে মাঝি, হে মনে হয় ভাত খাইতে গেছে।"

তার সাথে কথা না বাড়িয়ে নৌকা থেকে নেমে যেতে লাগলাম। পেছন থেকে ডেকে বললো, "ভাই সাব, পাঁচ মিনিট হাঁটলে একটা বাজার পাইবেন। ঐ বাজারে খোঁজ লইয়া দেইখেন। ওখানে না পাইলে

কোনো হানে পাইবেন না। আমাগো এলাকায় একটাই বাজার।"
বলতে বলতে বৈঠা বেয়ে কোথাও চলে গেলো।

এই এলাকায় একটাই বাজার, তার মানে এলাকাটা বেশি বড় নয়। যুবককে খুঁজে পেতেও অতটা বেগ পেতে হবে না।

হাঁটতে হাঁটতে বাজারে পৌঁছে গেলাম। মাঝির কথামতো এটাই তাহলে মিঠাচর বাজার। সূর্য তখন অনেকটা তির্যকভাবে আলো ছড়াচ্ছে। সবে মাত্র হাট বসতে শুরু করেছে। কিছু মুরুব্বীরা বোম্বাই মরিচ, পাকা কলা নিয়ে হাঁটু ভাজ করে বসে আছে। দেখে মনে হয় বিক্রি করতে নয়, এদের কাছে কেউ এগুলো পাহারা দিতে রেখে গেছে। জেলেরা নিজস্ব ঢোলা থেকে মাছ বের করে পানি ছিটাতে শুরু করেছে। চায়ের দোকানে টিভি চলছে। পুরোনো বাংলা সিনেমার সংলাপ ভেসে আসছে। সেখানে ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে ময় মুরুব্বিদের জটলা বেঁধেছে। তার পাশের একটা দোকানে দোকানদার শুধু একা বসে আছে। চায়ের কেতলির নিচে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। কেতলির মুখ থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সে ধোঁয়ার ক্ষুদ্র কণা আমার নাকে এসে পৌঁছেছে। চা খাওয়ার লোভ আর সামলাতে পারলাম না। চায়ের সাথে একটা বনরুটি নিয়ে বসে গেলাম।

পেটে খুব ক্ষুধা, বনরুটি রাক্ষসের মতো মুখে দিচ্ছি। এমন সময় পেছন থেকে কেউ একজন বললো, "ভাই, আপনি এখানে?"

ঘুরে তাকিয়ে যা দেখলাম, তার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। যুবকটি নিজ থেকেই আমার কাছে চলে আসবে, এটা আগে ভাবিনি। যুবকটিকে দেখে অবাক হয়েছি, এটা তাকে বুঝতে দেওয়া যাবে না।

তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম,"জি ভাই, আপনার খোঁজে আসছি। আপনার সাথে অনেক কথা আছে।"

আমার কথা শুনে যুবকটি চমকে গেলো। "মজা করছেন ভাই? আমার সাথে কী এমন কথা?"

"চা খাবেন?"

"না, কিছুক্ষণ আগে খেয়েছি।"

চা শেষ করার সাথে সাথে যুবকটি দোকানদারকে টাকা দেওয়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়লো। আমাকে কিছুতেই টাকা দিতে দিলো না। বললো, "আপনি আমাদের এলাকায় আসছেন, আপনি আমাদের মেহমান। মেহমানকে এইটুকু আপ্যায়ন করতে পারি না!"

সময় নষ্ট না করে যুবকটিকে নিয়ে নদীর পাড়ে চলে আসলাম। জায়গাটা নিরিবিলি। গোপন কথা বলার জন্য মানানসই। কথা সেরে এখান থেকেই বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হবো। আর কোনো কথা না বাড়িয়ে সোজা বলে ফেললাম,

"আচ্ছা, আপনি সেদিন প্রতিশোধের কথা বলছিলেন। কিসের প্রতিশোধ?"

"মজা করে বলছিলাম। সেই কথা শুনতে এই এলাকায় চলে আসলেন! আল্লাহ আপনাকে বাঁচিয়ে রাখুক।"

"আমাদের এলাকায় মোশাররফ মিয়া খুন হইছে। তার পরের দিন থেকে আপনাকে ঐ এলাকায় দেখছি না, কারণ কী?"

"ভালো লাগে না তাই এসে পড়ছি। এর জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে?"

"দেখুন, আমার পুরোপুরি সন্দেহ হয় খুনটা আপনি করেছেন। তাই আপনাকে ধরিয়ে দিতে আমি আপনার এলাকায় পুলিশ নিয়ে আসতে পারতাম। আসি নাই, কারণ আপনি কেন খুনটা করেছেন এই কাহিনিটা আমি শুনতে চাই। আর আপনাকে একটা ধন্যবাদ দিতে এসেছি, কারণ আমি মোশাররফ মিয়াকে হত্যা করতে চাইছিলাম। তার আগেই আপনি যখন করেছেন, তাই আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদটা আপনার প্রাপ্য।"

"তাহলে আমিও ধরে নেই খুনটা আপনি করেছেন। কখন থেকে ঘ্যানঘ্যান করছেন! এতো বলছি খুন আমি করি নাই, তারপরও একই কথা বারবার বলছেন। যান বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করেন, সব ভূত

মাথা থেকে নেমে যাবে। আসছে গোয়েন্দাগিরি করতে!"

যুবকটির এই ধরনের কথা শুনে লজ্জায় পুরো মুখমণ্ডল এলোমেলো হয়ে গেলো। তার মুখ থেকে তেড়ে আসা আর কোনো বুলেট সহ্য করতে পারবো না। বাড়ির পথ ধরাই ভালো। এক-দু'পা করে নদীর কিনারায় নেমে চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম আশেপাশে কোনো নৌকা আছে কিনা। একটা নৌকা দেখতে পেলাম কিছু যাত্রী নিয়ে এদিকেই আসছে।

"শুনুন" পেছন থেকে ডাক আসলো।

"জি, বলুন"

"আমি সত্যি মোশাররফ মিয়াকে খুন করি নাই, তবে খুন করার নিয়ত ছিলো। তাই সেদিন আপনাকে প্রতিশোধের কথা বলছিলাম। মাঝখান থেকে কোন হারামজাদা এসে খুনটা করে ফেলে। এখন ঐ এলাকায় থেকে আমার লাভ নেই, তাই বাড়িতে চলে আসছি।"

কৌতূহল মেটাতে জিজ্ঞেস করলাম, "কেন খুন করতে চাইছিলেন?"

ততক্ষণে নৌকাটি ঘাটে এসে পৌঁছেছে। মাত্র তিনজন যাত্রী নামার পর মাঝি আমার উদ্দেশ্যে বললো, "ওপার যাইবেন?"

আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে যুবকটি মাঝিকে বললো,

"ঐ ছৈলা গাছের নিচে বসে থাকেন। তার যাওয়ার সময় হলে ডাক দিবো।"

মাঝি ঠিক যুবকটির কথামতো ছৈলা গাছের নিচে বসে থাকলো। এতটা দূরত্বে এখানের কথা তার কানে পৌঁছাবে না।
যুবকটি আমার দিকে ফিরে বললো,

"কেন খুন করতে চাইছিলাম শুনবেন?"

"জি।"

"অবাক হইলাম, আপনি এখন পর্যন্ত আমার নামটাই জানতে চাইলেন না! অথচ আপনি আমাকে নিয়ে এতটাই কৌতূহলী। যাই হোক, আমার নাম আশিক। আপনাদের এলাকায় পরির মতো একটা

মেয়ে ছিলো। পরির নানা বাড়ি এই মিঠাচর। মাঝে মাঝে এই মিঠাচরে বেড়াতে আসতো। একদিন ঐ পরিকে দেখে এতই ভালো লাগে যে আমি মনের কথা আটকে রাখতে পারলাম না। হুট করে বলে দেই। সে প্রথমে রাজি ছিলো না, তারপর তিন মাস পর রাজি হয়। আমরা এখন যে জায়গাটায় বসে আছি, এই জায়গায় বসে আমি আর পরি কত কথা বলছি। তো একদিন ওর বিয়ে ঠিক হলো। ছেলে নাকি সরকারি চাকরি করে। এই বিয়েতে ও রাজি ছিলো না। তারপরও ওর পরিবার জোর করে বিয়ে দিতে চাইছিলো। এসব সহ্য করতে না পেরে পরি আমাকে সব বলে দেয়। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম পালিয়ে যাবো। একদিন রাতে হাশেমপুর গিয়ে পরিকে নিয়ে ফিরছিলাম। পথে মোশাররফ মিয়া ও তার সাথে কয়েকজনের সাথে দেখা। ওরা আমাকে মারধর করে, পরিকে আমার থেকে ছিনিয়ে নিলো। কয়েকদিন পর শুনি নদীতে পরির লাশ পাওয়া গেছে। সেই থেকে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য মোশাররফ মিয়াকে হত্যা করা। আমি অনেক ভীতু প্রকৃতির ছেলে। তাই ডাকাতি পেশায় যোগ দেই, হত্যার কারুকার্য শিখতে। আর হত্যার জন্য তাদের থেকে কিছু লোক সাথে নিতে। তা দুই বছর পরে এসেও পারলাম না।

আশিক থেমে গেলো। পাথরের মতো বসে একদৃষ্টিতে নদীর স্রোতের দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি বললাম, "আপনাকে কী বলে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, আপনার সেই পরির নাম কী ছিলো?"

"ফারজানা।"

নামটা শুনে অবাক হওয়ার কথা। হলাম না এ নামের সাথে উঠতে বসতে পরিচিত। তবে আশিকের মুখ থেকে ফারজানাকে নিয়ে মূল কাহিনি শুনে অবাক না হয়ে পারলাম না। তাহলে হারুন মামার মেয়ে কোথায়? ওর লাশও তো পাওয়া গেলো না। কে জানে, হয়তো এর মাঝেও লুকিয়ে আছে কোনো করুণ কাহিনি।

***

আশিকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাশেমপুরে চলে আসলাম। চারদিকে খবর ছড়ানো মোশাররফ মিয়ার খুনি জয়নাল শরীফ। সবুজের কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম মোশাররফ মিয়া ভোটের আগের দিন সবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে বেড়িয়েছে, জয়নাল শরীফ নির্বাচনে জিতলে এলাকার ফসলি জমি দখল করে কলকারখানা তুলবে। হুজুগে জনতাও তার কথায় কান দিয়ে জয়নাল শরীফকে ভোট না দিয়ে মোশাররফ মিয়াকে দেয়। ফলে সে জয়লাভ করে।
মোশাররফ মিয়ার এ মিথ্যা কার্যকলাপের জন্য জয়নাল শরীফ অনেক ক্ষেপে যায়। মোশাররফ মিয়ার সামনে গিয়ে অনেক গালাগালি করে ও তাকে খুনের হুমকি দেয়। মোশাররফ মিয়ার ভাই পুলিশকে গিয়ে জয়নাল শরীফের হুমকির কথা বলে দেয়। পুলিশ আর দেরি না করে জয়নাল শরীফকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।
সবুজও এটা নিয়ে ভীতিতে আছে। কারণ সবুজ জয়নাল শরীফের সাথে নির্বাচন করেছে। তাই যেকোনো মুহূর্তে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা সবুজের ওপর জারি হতে পারে।

হেড স্যার কয়েকদিন ধরে অসুস্থ। নাকি পুলিশের ভয়ে অসুস্থ হওয়ার ভান করে আছে কে জানে! তার স্কুলের শিক্ষক হিসেবে আমার তাকে দেখতে যাওয়া উচিত। সবুজও আমার সাথে যাবে বলে সিদ্ধান্ত নিলো।
বাজার থেকে আপেল, কমলা ও জুস নিয়ে তাদের বাড়িতে গেলাম। ঠিকই সে বিছানায় শুয়ে আছে। তার ছেলের বউ তাকে দেখাশোনা করছে। তার একমাত্র ছেলে ঢাকায় চাকরি করেন। শুনছি বাড়িতে টাকা পাঠায় না। মদ, গাঁজা ও বিভিন্ন নেশা পানি করে উড়িয়ে দেয়। হেড স্যারের জন্যই সংসার এতদিন টিকে আছে। সপ্তম শ্রেণিতে পড়ুয়া একমাত্র নাতির পড়াশোনার দায়িত্ব তার ঘাড়ে।

আমাদের দেখে বিছানায় শোয়া থেকে উঠে খাটে হেলান দিয়ে আধশোয়া হলো। আমার উদ্দেশ্যে বললো,

"স্কুলে বাচ্চারা ঠিকমতো আসে?"

"জি, আপনার শরীর আগের থেকে ভালো আছে?"

"আর ভালো। বাম পাশ দিয়ে কোমরটা কেমন ব্যথা করছে।" তারপর আর কোনো কথা খরচ না করে সোজা বললো, "কেসের কী অবস্থা?"

"জয়নাল শরীফকে ধরে নিয়ে গেছে।"

আমার কথা শুনে উনি এমন ভাব করলেন যেন প্রথম শুনছেন। অথচ তার পুত্রবধূর মাধ্যমে প্রতিদিন এলাকার খবর রাখছেন। একটু নেড়েচেড়ে বসে বললেন,

"এবার রাজনীতি করাটা বড্ড ভুল হয়ে গেছে। আজ জয়নাল শরীফকে ধরে নিয়ে গেছে, কাল আমাকে নিয়ে যাবে। আমার মানসম্মান ধুলোয় মিশে যাবে।" বলতে বলতে বাচ্চাদের মতো কেঁদে ফেললেন।

সবুজ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, "আপনি কোনো চিন্তা কইরেন না। জয়নাল শরীফকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করতে নিছে। এই কেস নিয়ে শক্তভাবে তদন্ত হইতাছে। এখন আপনার দিকে বিপদ আসলে আমার দিকেও আসবে। আমরা তো অপরাধ করি নাই। আল্লাহ আমাদের এমন সাজা দিবেন না।"

"তোমরা আমার জন্য দোয়া কইরো বাবারা। আর তোমরাও সাবধানে থাইকো। এলাকার হাবভাব বেশি ভালো না।"

ফলগুলো টেবিলের উপর রাখা ছিলো। সেদিকে চেয়ে বললেন, "এগুলো আনবার কি দরকার ছিলো? কে খাবে এসব!"

সবুজ বললো, "এরকমভাবে বইলেন না। আপনি তো আমাদের মুরুব্বি। আপনি না খেয়ে থাকলে অসুখ তো আরও বেড়ে যাবে।" তিনি ঘরের ভেতরের দিকে চেয়ে তার পুত্রবধূকে ডাক দিলেন,

"এই রেহেনা!"

রেহেনা ঘরের ভিতর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়ানোর পর হেড স্যার তার দিকে ফিরে বললেন, "এইগুলো ওদের কেটে দাও।"

তিনি বাধ্য মেয়ের মতো ফলগুলো নিয়ে ভিতরে চলে গেলেন।

ফল কেটে আমাদের সামনে দিলে আমি স্যারের দিকে ফলের থালা বাড়িয়ে দিলাম। তার এখন খেতে ইচ্ছে করছে না। তাই নাক কুঁচকে না করে দিলেন। আমি আর সবুজ ফলের একটা দুটো টুকরো মুখে দিচ্ছি এর মধ্যে হেড স্যারের নাতি এসে পড়লো। আমাদের কোনো রকম পাত্তা না দিয়ে সোজা স্যারের কাছে গিয়ে বললো,

"দাদা, আজ স্কুলে পুলিশ আসছে। তারপর এক ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে।"

"কোন ছেলে? কেনো ধরে নিয়ে গেছে?"

দুইটা প্রশ্নের উত্তর ও রেডি করে নিয়ে আসে নাই। বাচ্চা মানুষ, এসব ব্যাপারে কৌতূহল নেই মনে হয়। সোজাভাবে বলে দিলো,

"জানিনা, তবে সবাই বলাবলি করছে মোশাররফ মিয়াকে ঐ ছেলে খুন করছে, তাই পুলিশ নিয়ে গেছে।"

"আরে কী কারণে যেন নিয়ে গেছে। মাধ্যমিকে পড়ুয়া ছেলে খুন করবে, মানা যায় নাকি!"

সবুজ আমার দিকে ফিরে বললো, "একবার স্কুলের দিকে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখি।"

আমি কোনো প্রতিবাদ না করে ওর কথায় সম্মতি দিলাম।

স্কুলে গিয়ে দেখলাম সেখানে একটা পিঁপড়াও নেই। শুধু একটা গরু মাঠে আপন মনে ঘাস খাচ্ছে। আশেপাশে দু-একটা দোকান ছিলো, তাও বন্ধ। দপ্তরি শাহজাহান দাদা স্কুল তাড়াতাড়ি ছুটি হলেও তিনি বাড়ি ফেরেন সন্ধ্যার সময়। আজ তাকেও দেখতে পাচ্ছি না। পুরো ব্যাপারটি কেমন খটকা মনে হচ্ছে। এর চেয়ে বাড়িতে ফিরে যাই। কায়েসের কাছে জিজ্ঞেস করলে সব জানতে পারবো। ওখান থেকে সবুজ ওদের বাড়ি ফিরে গেলো। আমি যেতে লাগলাম আমাদের বাড়ি।

আম্মার কাছে কায়েসের খোঁজ করলাম। তিনি জানালেন কায়েস এখনো বাড়িতে ফিরে নাই। এই কথা শুনে কপালে মৃদু ঘাম জমেছে। ভিতরে কেমন অস্বস্তি ভাব। বুকের ভেতর ব্যাঙটা লাফিয়ে চলছে। স্কুল

ছুটি হলে কায়েস এক মুহূর্ত দেরি না করে সোজা বাড়ি চলে আসে। স্কুল ছুটি হলো প্রায় দুই ঘণ্টা, এখনো কায়েস ফিরলো না। তবে কি কায়েসকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে!
হেড স্যারের বাড়ির উদ্দেশে তাড়াহুড়ো করে হাঁটা শুরু করলাম।
আম্মা পিছন থেকে ডেকে চলছেন,

"যাস কই? সারাদিন বাইরে ছিলি। এখন পর্যন্ত গোসল করোস নাই, খাওয়া-দাওয়া করো নাই!"
আমি তার কথা অবজ্ঞা করে হেঁটেই চলছি।

রাস্তায় কখনো দৌড়াচ্ছি, কখনো হাঁটছি। মনের ভিতর শুধু খচখচ করছে কায়েসের স্কুল ছুটি হলে সোজা বাড়ি চলে আসে, আজ কেনো আসলো না! ঐদিকে শুনলাম, পুলিশ স্কুল থেকে কাকে ধরে নিয়ে গেছে।
কাকে নিবে! ঐদিন খেয়াল করলাম কায়েস এই কেসের ব্যাপারে অনেক কৌতূহলী। এতোটা কৌতূহল কোনো কিছু নিয়ে এর আগে হতে দেখি নাই। তাহলে কায়েস কি খুন করেছে? না... ও কেমনে করবে একটা মুরগি জবাই করার তো সাহস ওর নেই।

হেড স্যারের বাড়িতে গিয়ে তার নাতনির কাছে জিজ্ঞেস করলাম,

"পুলিশ যে ছেলেটাকে নিয়ে গেছে, তুমি তাকে চিনো?"

"চিনি। ভালো ফুটবল খেলে। তবে এখন নামটা মনে পড়ছে না।"

"তুমি আমাকে চিনো?"

"জি, আপনি প্রাইমারি স্কুলের স্যার।"

"আমার ভাইকে চিনো?"

"আপনার ভাই আছে, আমি জানি না।"

"আমার ভাইয়ের নাম কায়েস।"

ও এমন ভাব করলো যেন হাতের নাগালে চাঁদ পেয়েছে। "ও হ্যাঁ, মনে পড়ছে। কায়েস ভাইকে ধরে নিয়ে গেছে।"

কথাটা ও এতোটা স্বাভাবিকভাবে বলে দিলো। কিন্তু আমার মাথায়

আকাশ ভেঙে পড়লো। কায়েসকে কেনো পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে! আবার নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম তদন্তের জন্যেও তো নিয়ে যেতে পারে। তবে ও এই কেস সম্পর্কে এমন কী জানে!

স্যার এতক্ষণ আমাদের কথোপকথন শুনছিলেন। তিনি বললেন,
"থানায় গিয়ে দেখো, পুলিশ কী বলে।"

সোজা সবুজের বাড়িতে চলে গেলাম। সবুজ দুপুরের খাবার খেতে বসে গেছে। আমি গিয়ে বাধা দিলাম। বললাম, "তাড়াতাড়ি আমার সাথে চল। কায়েসকে পুলিশ নিয়ে গেছে।"

সবুজ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো। আমার উত্তেজনা তখন চরম পর্যায়ে। অনেক দূর দৌড়ে এসেছি তাই হাঁপাতে লাগলাম। আমার এমন অবস্থা দেখে সবুজ বিশ্বাস করতে বাধ্য হলো আসলেই কায়েসকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। সবুজ অর্ধেক ভাত থালায় রেখে পানি মিশিয়ে আমার সাথে থানার দিকে রওনা হলো।

মোটরসাইকেলে করে প্রায় তেরো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে থানায় এসে পৌঁছালাম। কারো কোনো অনুমতির অপেক্ষা না করে সোজা ওসির রুমে ঢুকে পড়লাম। ওসি আমাদের দেখে অবাক হয়ে বললো,

"কি ব্যাপার, আপনারা কারা? এভাবে হঠাৎ ঢুকে পড়লেন?"

সবুজ বললো, "আপনারা আজ হাশেমপুর স্কুল থেকে কোনো ছেলে নিয়ে এসেছেন?"

"জি। আপনারা তার স্বজন বুঝি?"

সবুজ আমার কাঁধে হাত রেখে বললো, "যাকে ধরে নিয়ে এসেছেন, ও তার ভাই।"

ওসি সাহেব আমার দিকে ফিরে বললেন, "ও, আপনি নিয়াজ সাহেব?"

"জি।"

তিনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "আসলে এই কেসের তদন্ত এত

তাড়াতাড়ি শেষ হবে, আর আসামিকে এত তাড়াতাড়ি ধরবো বুঝতে পারিনি। তবে এটা আরও সহজ করে দিলো ঘটনাস্থলের একশো মিটার দূরে পাওয়া একটা রক্তমাখা বই। বইয়ের উপর সুন্দর করে লেখা ছিলো 'কায়েস'। হাশেমপুর স্কুলে গিয়ে আপনার ভাইকে খুঁজে থানায় এনে সব জিজ্ঞেস করি। ও সুরসুর করে সব বলে দিয়েছে।"

"আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি বলতে চাইছেন কায়েস মোশাররফ মিয়াকে খুন করেছে? আমি আমার ভাইকে খুব ভালো করে চিনি। ও এমন করতে পারে না। দয়া করে খুনের দায় ওর উপর চাপিয়ে দিবেন না।"

ওসি সাহেব ভুরু কুঁচকে বললেন, "আচ্ছা, আপনি আপনার ভাইয়ের সাথে দেখা করুন। তারপর তার মুখ থেকেই শুনবেন। ঐ যে, ঐ বারান্দাটা পার হলেই ওকে দেখতে পাবেন।"

কোনো রকম দেরি না করে সেদিকে গেলাম। কায়েস চৌদ্দ শিকের ভিতর খুব আয়েশ করে বসে আছে, তবে অপরদিকে ঘুরে। গিয়ে ডাক দিলাম, "কায়েস!"

ও মুখটা কাঁধের সাথে ঘষে ফিরে তাকালো। মনে হলো চোখের পানি মুছে ফেলছে। আস্তে আস্তে আমার কাছে এসে স্বাভাবিকভাবে বললো, "ভাইয়া, আমি পুলিশকে সব বলে দিয়েছি।"

"কি বলে দিয়েছো?"

"আসলে ভাইয়া, তোমরা আমাকে পরিবারের কোনো সদস্য মনে করো না। আব্বা মারা যাওয়ার পর সব দায়িত্ব তুমি কাঁধে তুলে নিয়েছো। আমি যা চাই, তোমার হাজার কষ্ট হলেও সেটা তুমি পূরণ করে দাও। আমার স্কুলের বেতন, পড়াশোনার খরচসহ কত টাকা তুমি দিয়েছো। একবারও আমার ওপর অভিযোগ করোনি। তোর এত টাকা লাগে কেনো?' এমন কথাও করোনি। এত ভালোবাসো, তাই বলে পরিবারের সব কথা আমার থেকে আলাদা করো কেনো? আমি কি তোমাদের কেউ না?"

"তোর কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। সব কিছু খুলে বল।"

"তোমরা ভাবছো আমি কিছুই জানি না। আমি সব জানি।"

"কি জানো?"

"একদিন রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। তখন তোমার রুম থেকে কারো কান্নার আওয়াজ পাই। আমি দেয়ালের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন আম্মা তোমাকে আমাদের পরিবার নিয়ে অনেক কথা বলছিলো আব্বার মৃত্যু, শিলা আপুর আত্মহত্যার কারণ... সেদিন আমি দেয়ালের ওপাশ থেকে শুধু কেঁদেই গেছিলাম। তার পরেরদিন থেকে আমার অভিযান শুরু।"

"কি নিয়ে অভিযান?"

কায়েস দাঁত কিড়মিড় করে বললো, "মোশাররফ মিয়া।"

"তার মানে?"

কায়েস আমার কাছ থেকে পিছন সরে গিয়ে অপরদিকে ফিরে দেয়ালের কাছে বসে পড়লো। হাতে একটি কোথা থেকে জোগাড় করা খড়ি নামক বস্তু। যেটা দিয়ে ইচ্ছে মতো ছবি আঁকা যায়।